আষাঢ় ১৩৯৫
জুলাই ১৯৮৮
ছোটদের সচিত্র মাসিকপত্র
গল্প · কবিতা · উপন্যাস · প্রবন্ধ · খেলাধুলা · ধাঁধা · প্রতিযোগিতা · বিজ্ঞান ও আরো কত কী!
লীলা মজুমদার, নলিনী দাশ ও সত্যজিৎ রায় সম্পাদিত

পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি ও স্ক্যান - দেবাশিষ রায়

এডিট - অপ্তিমাস প্রাইম

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি কোন পত্রিকার কোন স্পেসাল ইস্যু থাকে এবং
আপনি সেটা যদি স্ক্যান করে দিয়ে আমাদের প্রজেক্টকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চান
তাহলে নিচের ইমেলে যোগাযোগ করুন

optifmcybertron@gmail.com

১৩৯৫ সালের সন্দেশের দাম ও চাঁদার হার

১৩৯৫ সালে সন্দেশের আয়তন ২৫% বাড়ল—প্রতি সংখ্যার দাম ৪.০০। শারদীয়া সংখ্যা (আনুমানিক) ২০.০০।

বার্ষিক (বৈশাখ-চৈত্র) সডাক ৫০.৫০, শারদীয়া সংখ্যা রেজিস্টার্ড ডাকে যাবে।

শারদীয়া সংখ্যা হাতে নিলে বৈশাখ-চৈত্র ৪৫.০০, সব কটি সংখ্যা হাতে নিলে ৪০.০০।

এখনও চাঁদা না পাঠিয়ে থাকলে তাড়াতাড়ি পাঠাও।

প্রতি বাংলা মাসের মাঝামাঝি, ইংরাজী মাসের প্রথমে সন্দেশ প্রকাশিত হয় এবং Under Certificate of Posting পাঠান হয়।

ইংরেজি মাসের তৃতীয় সপ্তাহেও বই না পেলে লিখিত নালিশ জানালে ডুপ্লিকেট দেওয়া হয়।

সন্দেশের চাঁদা মানিঅর্ডারে, নগদে অথবা 'চেকে' পাঠান যায়। Sandesh নামে চেক লিখবেন, মফঃস্বলের চেক দিলে ভাঙ্গাবার খরচ আট টাকা লাগবে। পোস্টাল অর্ডার নেওয়া হয় না।

গ্রাহক-গ্রাহিকারা চিঠিপত্র, ধাঁধার উত্তর, লেখা, ছবি ইত্যাদি পাঠাবার সময়ে গ্রাহক নম্বর, নাম ঠিকানা ও বয়স স্পষ্ট করে লিখবে। সন্দেশ পাঠাবার সময়ে নামের বাঁ পাশে গ্রাহক সংখ্যা লিখে দেওয়া হয়। গ্রাহক স্কুল, ক্লাব বা লাইব্রেরির প্রতিটি ছাত্র/মেম্বার গ্রাহক। ব্যক্তিগত উত্তর চাইলে জোড়া পোস্ট কার্ড লিখতে হবে।

লেখকেরা স্বনামাঙ্কিত পোস্টকার্ড দিলে ফলাফল জানানো হবে। উপযুক্ত টিকিটযুক্ত খাম না দিলে অমনোনীত লেখা ফেরত দেওয়া হবেনা। কোন মাসে লেখা পাঠানো হয়েছিল সঠিকভাবে না জানালে ফলাফল জানানো সম্ভব নয়। আলগা টিকিট পাঠাবেন না।

হাতে নিলে পাঁচ, ডাকে নিলে পনের কপির কমে এজেন্সি দেওয়া হয় না। আমরা নিজব্যয়ে মফঃস্বল এজেন্টকে পত্রিকা পাঠাব কিন্তু ফেরত দেবার ডাক খরচ এজেন্টকে দিতে হবে। বেশি ফেরত নেওয়া হয় না।

বিজ্ঞাপনদাতারা অনুগ্রহ করে ছয় সপ্তাহ আগে ব্লক, আর্টপুল, পাণ্ডুলিপি পাঠাবেন।

বিজ্ঞাপন প্রতিনিধি—আনন্দ ঘোষ

সন্দেশ কার্যালয়—১৭২/৩, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৯ ফোন : ৪৬-৪৯১৯
নিউস্ক্রিপ্টের দোকান—এ-১৪, কলেজস্ট্রিট মার্কেট, কলিকাতা ৭০০০০৭

পাতিরাম বুক স্টল কলেজ স্ট্রীট জংশন	রথীন বর্মন টাইমস অব ইণ্ডিয়া ও হাওড়া এলাকায়	প্রশান্ত নন্দী গড়িয়াহাট বিপনি গড়িয়াহাট মোড়	অবনী দেয়াসী হাজরা মোড়
শ্যামল ভট্টাচার্য ৭৭ মহাত্মা গান্ধী রোড কলি-৯ (স্টেমার লেনের মুখে)	পাত্র বুক স্টল	রসরাজ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট	সুশীল দত্ত শ্যামবাজার

হাওড়া, শিয়ালদহ ও অন্যান্য বড় বড় রেলওয়ে স্টেশনে হুইলার বুক স্টল

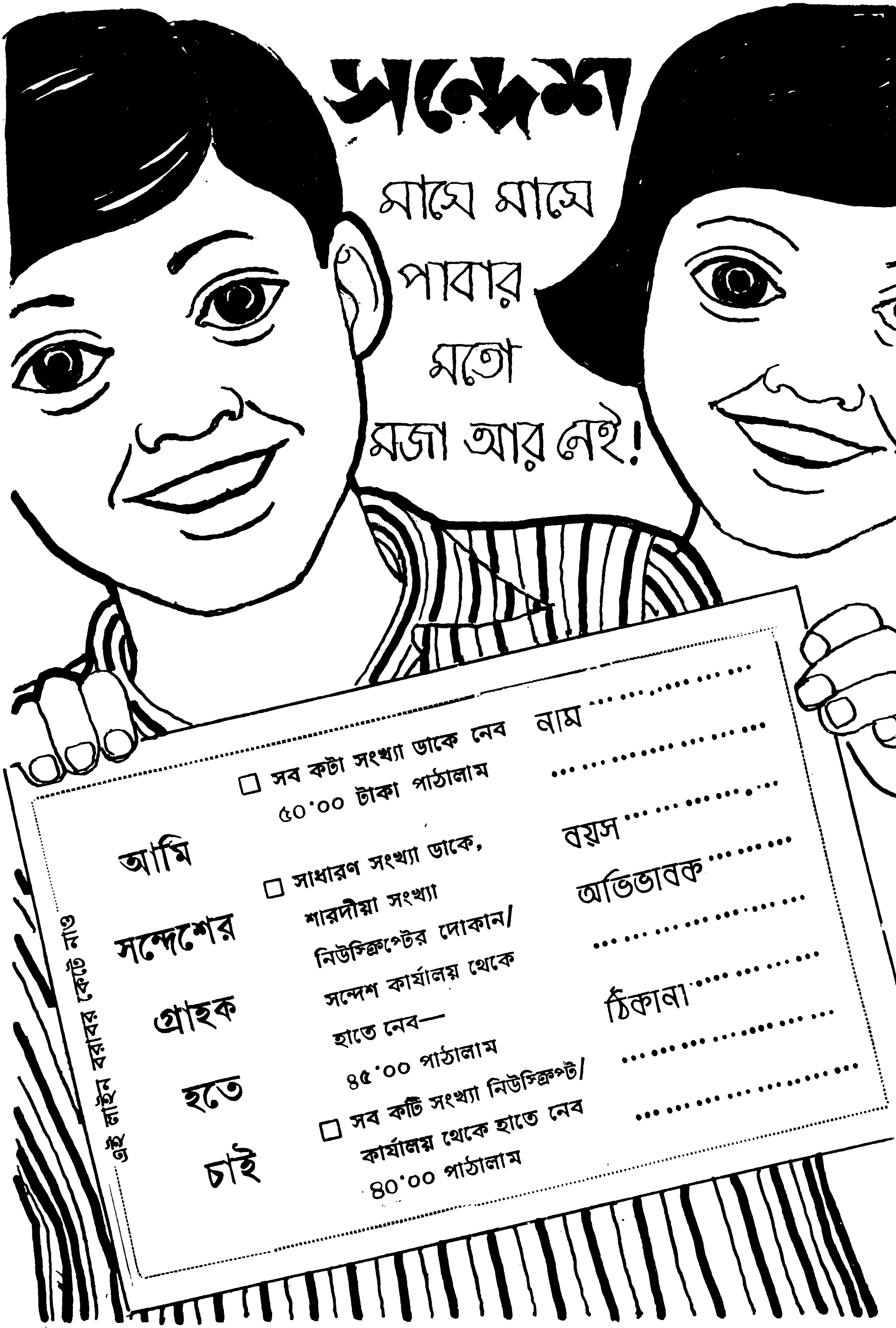

সন্দেশ
মাসে মাসে পাবার মতো মজা আর নেই!
□ সব কটা সংখ্যা ডাকে নেব
৫০·০০ টাকা পাঠালাম
আমি সন্দেশের গ্রাহক হতে চাই
□ সাধারণ সংখ্যা ডাকে, শারদীয়া সংখ্যা নিউস্‌স্ক্রিপ্টের দোকান/ সন্দেশ কার্যালয় থেকে হাতে নেব—
৪৫·০০ পাঠালাম
□ সব কটি সংখ্যা নিউস্‌স্ক্রিপ্ট/ কার্যালয় থেকে হাতে নেব
৪০·০০ পাঠালাম
নাম
বয়স
অভিভাবক
ঠিকানা
এই চিহ্ন বরাবর কেটে নাও

সার্থক অনুবাদের মাধ্যমে প্রতিবেশী ও বিদেশী সাহিত্যকে পাঠকের সামনে আনার দায়িত্ব নিয়েছে সাহিত্য অকাদেমি। তারই কয়েকটি—

বাংলায় মূল চার খণ্ডের পূর্ণ ও প্রামাণ্য অনুবাদ জোনাথান সুইফটের **গালিভারের ভ্রমণ বৃত্তান্ত**
অনুবাদ করেছেন লীলা মজুমদার ৩০·০০ টাকা

শেক্সপীঅরের **ওথেলো** অনুবাদ করেছেন
সুনীল কুমার চট্টোপাধ্যায় ১২·০০

তামিল ছোটগল্প থেকে **তামিল গল্প সঞ্চয়ন**
অনুবাদ করেছেন শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য ২৫·০০

কন্নড় গল্প থেকে **কর্ণাটকের ছোটগল্প** অনুবাদ করেছেন বি. জি. রাও ও অমিয়া রাও ১০·০০

সাহিত্য অকাদেমির নিম্নলিখিত ঠিকানা থেকে
এই সকল গ্রন্থ সংগ্রহ করা যাবে

সাহিত্য অকাদেমি

রবীন্দ্র ভবন	ব্লক ৫-বি
৩৫ ফিরোজ শাহ রোড	রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়াম
নয়া দিল্লী-১	কলিকাতা-২৯

বাংলার সেরা তাঁতের কাপড়

- সেরা জাতের ছাপা সিল্ক শাড়ী;
- বাংলা তাঁতের শাড়ীর মন-মাতানো রং আর ডিজাইনের আকর্ষণীয় সমাহার।
- পলিয়েস্টার, সিল্ক শার্টিংস, তসর এবং সুতি শার্টিংস, ধুতি ও লুঙ্গী।
- তাঁত ও ছাপা বেডশীট, বেড-কভার এবং রং-বেরঙের কভার।

তন্তুশ্রী

ওয়েস্ট বেঙ্গল হ্যাণ্ডলুম এণ্ড পাওয়ারলুম ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিঃ
(পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের সংস্থা)
৮-এ রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার
(৭ম তল) কলিকাতা-৭০০০১৩

সোভিয়েত দেশ থেকে প্রকাশিত ছোটদের জন্য মনমাতানো বই, পত্রপত্রিকা, পোস্টেজ স্ট্যাম্প-এর অন্যতম বৃহত্তম পরিবেশক—

ভস্তক

(হাউস অফ্ সোভিয়েত বুকস্ এ্যাণ্ড পিরিওডিকালস্)

এ-সি ২১০ সল্ট লেক, কলিকাতা-৭০০ ০৬৪
৭ ক্যামাক স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০ ০১৭
৭৯ মহাত্মা গান্ধী রোড. কলিকাতা-৭০০ ০০৯
সেন্ট্রাল রোড, শিলচর, অসম
যশবন্ত রোড, পানবাজার, গুয়াহাটী, অসম

সোভিয়েত পত্রিকার গ্রাহক হয়ে মস্কোতে মুদ্রিত ক্যালেণ্ডার উপহার নিন।

সাইকেলে নেপাল যাত্রা

গত ১৯শে মে, রবিবার, সকালে, আমাদের গ্রাহক বন্ধু (৫৩৮) প্রলয় তালুকদারের দাদা পল্লব তালুকদার ও তার বন্ধু সঞ্জীব মজুমদার সন্দেশ কার্যালয়ের সামনের ত্রিকোণ পার্ক থেকে সাইকেলে নেপাল রওনা হয়েছে। তারা নেপালের মানুষের জন্য ভারতবাসীদের শুভেচ্ছা আর শান্তির বাণী নিয়ে গেছে। তোমাদের সকলের হয়ে আমরাও তাদের শুভকামনা জানিয়েছি।

এ বিষয়ে আরো খবর পেলে জানাব

সঃ সঃ

আষাঢ় ১৩৯৫

সন্দেশ

ছেলেমেয়েদের সচিত্র মাসিকপত্র

জুলাই ১৯৮৮

গল্প সংখ্যা

সম্পাদক

লীলা মজুমদার, নলিনী দাশ, সত্যজিৎ রায়

গল্প

চিল-মা / উপেন্দ্রকিশোর রায় ১৯৪
ভবম হাজাম / কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় ১৯৭
ছোট বৌ / উপেন্দ্রকিশোর রায় ২০০
জাপানী দেবতা / উপেন্দ্রকিশোর রায় ২০৩
গণৎকার তারিণীখুড়ো / সত্যজিৎ রায় ২১২
শিবুদার চতুর্থ বিস্তার / লীলা মজুমদার ২১৬
ইরমিকির / মহাশ্বেতা দেবী ২১৯
সোনা / গৌরী ধর্মপাল ২৩৩
প্রজাপতিরা আগে গান গাইত / দেবব্রত ঘোষ ২৪৮
দেয়ালে মুখের আদল / ই ভি. লুকাস ২৫১
রথের গল্প / সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায় ২৫৭
অবদান / রীতা রায় ২৬২
পতিত ও ম্যানুয়েল পেড্রো / শিশির বিশ্বাস ২৬৩

ধারাবাহিক উপন্যাস

থার্টি'ন আপ ঝমঝমা এক্সপ্রেস / শিশির কুমার মজুমদার ২৩৬

ছড়া–কবিতা–গান

যখন বড় হব / উপেন্দ্রকিশোর রায় ১৯৩
খোকাবাবুর সার্কাস / কালিদাস রায় ১৯৯
গান / উপেন্দ্রকিশোর রায় ২১১
ময়ূর / বিশ্বপ্রিয় ২২৭
ভূত ছাড়ানোর গল্প / অশোক মুখোপাধ্যায় ২৩০
মিথ্যে কথায় সিদ্ধিলাভ / করুণাময় বসু ২৩৫
ভুলো মানুষ / আশিস মুখার্জি ২৪৬
অভিনব আইডিয়া / ভবানী প্রসাদ মজুমদার ২৫৫
নামেতে কি আসে যায় /সুমন্ত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ২৫৫
লেখা আছে বইতে / সুবীর গুপ্ত ২৫৬
মন্দ ভাগ্য / সুখেন্দু মজুমদার ২৬০
বাদলের বাদ্য / শ্রীকর নন্দী ২৬০

কমিক স্ট্রিপ

টোটোর অ্যাডভেঞ্চার/গল্প—নলিনী দাশ, ছবি—প্রশান্ত ২২৮
ন্যাড়া / হিজিবিজবিজ ২৪৭ ২৬১
কালাচাঁদ বনাম পাগলা দাশু ২৫০
কথাবার্তা/উপেন্দ্রকিশোর রায় ১৯৬
মজার চিঠি ২৩২

চিল-মা / উপেন্দ্রকিশোর রায়

সন্দেশ

ছেলেমেয়েদের সচিত্র মাসিকপত্র

আষাঢ় ১৩৯৫

জুলাই ১৯৮৮

যখন বড় হব

উপেন্দ্রকিশোর রায়

আমি তাই ভাবি বসে ছেলেবেলা কদিন রবে,
শেষে যখন বড় হব তখন কিবা করব সবে।
তখন মোরা সবাই হব অতিশয় সুস্থির,
আর ভারি বিদ্বান, আর বড় গম্ভীর।
থাকব না ত দিনরাত শুধুই খেলা নিয়ে,
কব কাজের কথা, সবাই শুনবে মন দিয়ে।
বড় লোক হই যদি কাজ করব ভারি
না হলেও করব কাজ যতটুকু পারি।
সব কাজ, কাজ ভাই, ছোট বড় হোক যাই
ভাল পথে খেটে খাই, তাতে লাজ নাই ভাই।
দোকান করিলে দিব জিনিসটি খাঁটি,
হক দর, ঠিক মাপ, কাজ পরিপাটি।
ডাক্তার হই যদি করো নাকো ভয়,
মিষ্টি ওষুধ দিব খেতে, তেতো ঝাঁঝি নয়।
লিখি যদি বই, তার দাম হবে অল্প,
রাঙা ছবি পাতে পাতে, আর শুধু গল্প।
মোরা যদি রাঁধি, খেয়ে হবে খুশি,
নুন দিব ঠিক ঠিক, ঝাল নাই বেশি।

চিল মা

উপেন্দ্রকিশোর রায়

এক যে ছিল বড় ঘরের ছোট বৌ, তার ছিল টুকটুকে একটি খুকী। বৌটি বসে কুট্‌নো কুট্‌ছে, খুকীটি হামা দিয়ে ছাতে চলে গেছে। সেইখানে ছিল এক চিল বসে; সে খুকীটিকে দেখতে পেয়েই ছোঁ মেরে নিয়ে গেছে, বৌ তার কিচ্ছু জানে না।

খুকীটিকে নিয়ে চিল একেবারে ঘন বনের ভিতরে তার বাসায় চলে গেল। সেইখানে খুকী থাকে, চিলের সঙ্গে খেলা করে, তার পাখায় মুখ লুকিয়ে হাসে। চিল দেশ বিদেশে ঘুরে তার জন্যে খাবার নিয়ে আসে, ঝড় বাদলে তাকে ডানা দিয়ে ঢেকে নিয়ে বসে থাকে।

দিন যাচ্ছে, খুকীও বড় হচ্ছে, আর দেখতে হয়েছে যেন দেবতার মেয়ে। চিল তাকে কোত্থেকে একটা চড়কা এনে দিয়েছে, তাই নিয়ে সে দিনরাত খেলা করে।

এর মধ্যে একদিন হয়েছে কি, সেই দেশের যে রাজা তিনি বনে এসেছেন শিকার করতে। সঙ্গে কতই লোকজন এসেছে, তারা ঝোপে ঝোপে উঁকি মেরে হরিণ খুঁজে বেড়াচ্ছে। খুঁজতে খুঁজতে তারা সেই চিলের বাসার কাছে এসে বলল, "ভালরে ভাল, চিলের বাসায় চড়কার শব্দ কি করে হচ্ছে?"

ব'লে তারা যেই গাছে উঠে দেখতে যাবে, অমনি চিল কোত্থেকে ছুটে এসে নখ আর ঠোঁট দিয়ে তাদের নাক মুখ ছিঁড়ে দিতে লাগল। তখন তারা চিপ চাপ গাছ থেকে পড়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে রাজার কাছে এসে বল্ল, "রাজা মশাই, এমন ত কখন শুনিনি;—চিলের বাসায় বসে কে চড়কা কাটছে। আমরা দেখতে গিয়েছিলুম, তাইতে দেখুন আমাদের কি দশা হয়েছে।"

একথা শুনে রাজা নিজেই সেই গাছের তলায় এলেন। তাঁকে দেখেই চিল সেই গাছ থেকে উড়ে চলে গেল। তিনি গাছে উঠে দেখলেন পরীর মত সুন্দর একটি মেয়ে চিলের বাসায় বসে আছে।

রাজা মহাশয়ের শিকার করা হল না। তিনি যারপর নাই আদর করে সেই মেয়েটিকে বাড়ীতে নিয়ে এলেন। তারপর পুরুত ডেকে বাজনা বাজিয়ে হাসি গান আর আলোর ভিতরে তার সঙ্গে তার বিয়ে হয়ে গেল। সবাই বল্লে, "কি সুন্দর রাণী! কি সুন্দর রাণী!"

রাজার আরো ছয়টি রাণী ছিল। নূতন রাণীকে দেখে তাদের ত ভারী হিংসা হয়েছে। তারা তার বাপের নাম জিজ্ঞাসা করে, বাড়ীর কথা জিজ্ঞাসা করে, বেচারা তার কিছু বলতে পারে না। তখন তারা রাজাকে বল্ল, "কোথাকার কোন ছোটলোকের মেয়ে বিয়ে করে এনেছ, বাপের নাম বলতে পারে না।" রাজা বল্লেন, "কি করে বলবে? জন্মে অবধি চিলের কাছে ছিল, বাপ মায়ের মুখ দেখতে পায় নি। ওর মুখের দিকে চেয়ে দেখ দেখি, কাকে ছোট লোকের মেয়ের মতন দেখায়।"

তখন থেকে রাণীরা ত হিংসায় যেন মরেই যেতে লাগল। তারা দিনরাত ভাবে, কি করে ছোট রাণীকে জব্দ করবে। এর মধ্যে একদিন রাজা রাণীদের বল্লেন যে, "তোমাদের নিজের নিজের ঘর বেশ করে সাজাও ত, দেখি কার কেমন পছন্দ।" একথা শুনে বড় রাণীরা ভাবল, "বেশ হয়েছে, ও ছোট লোকের মেয়ে, ভাল করে ঘর সাজাতে পারবে না, আর রাজার কাছে বোকা বনে যাবে।"

তারা সবাই মিলে যুক্তি করে রাজার কাছ থেকে দামী দামী ঝাড়লণ্ঠন পর্দা ঝালর গালিচা এনে নিজের নিজের ঘর সাজাল। ছোটরাণী বেচারা কি করবে? সে মনের দুঃখে বাগানে গিয়ে কাঁদতে কাঁদ্‌তে বল্ল,

"এক গাছে টান দিতে বেত গাছ নড়ে,
চিল মা, চিল মা, আয় মা উড়ে!"

বলতে বলতেই সেই চিল উড়ে এসে বল্ল, "কি হয়েছে মা? কেন ডেকেছ?"

ছোটরাণী বল্ল, 'রাজা বলেছেন ঘর সাজাতে, বড় রাণীরা তাদের ঘর কি চমৎকার করে সাজিয়েছে। আমি ত মা কিছু জানিনা; কি করে আমার ঘর সাজাব ?"

চিল বল্ল "এই কথা ? আচ্ছা মা, তোমার কোন ভাবনা নেই। একটু বস, আমি এখ্খুনি আসছি।"

বলে চিল কোত্থেকে একটা গাছের ডাল নিয়ে এসে বল্ল, 'এই ডালের পাতাগুলি ঘরের দেয়ালে, ছাতে, দরজায়, মেঝেতে, আর সব জিনিসপত্রে নিয়ে ঘসে দাও, আর কিছু করতে হবে না।"

এই কথা বলে চিল চলে গেল, আর ছোট রাণী তার ঘরে এসে সকল জায়গায় আর জিনিস পত্রে সেই ডালের পাতা ঘসে দিল। দিতেই দেখে যে সে ঘরের যা কিছু দরজা, জানালা, কড়ি, বরগা, ইঁট অবধি সব সোনার হয়ে গেছে! খাট সোনার, লেপ তোষক, বালিস মশারি অবধি সব সোনার!

রাজা ত আর রাণীদের ঘর দেখে ভারী খুশী হয়ে এসেছেন, আর ভাবছেন, ছোট রাণী হয় ত কিচ্ছু করতে পারে নি। ছোট রাণীর ঘরে ঢুকে কিন্তু আর তাঁর মুখ দিয়ে কথা বেরুচ্ছে না। এমন সুন্দর ঘর কি আর কেউ কখনো দেখেছে ? বড় রাণীদের তখনি ডেকে এনে রাজা বল্লেন, দেখত কে ছোট লোকের মেয়ে! ছোট লোকের মেয়ের কাজ বুঝি এমনি হয় ?"

রাণীরা আর কি বলবেন ? বলবার কিছু থাকলে ত।

তারপর আরেক দিন রাজা বল্লেন, "তোমরা এক একদিন আমাদের রেঁধে খাওয়াও ত, দেখি কে কেমন রাঁধতে পারে।" বড় রাণীরা ভাবল, 'এই বেলা দেখা যাবে। ও আর যাই করুক মতন রাঁধতে আর ওকে হবে না।"

সত্যি সত্যিই রাণীরা সবাই খুব রাঁধতে পারত। তাঁদের এক একজনের ঘরে রাজা সকলকে নিয়ে খেতে আসেন; খেয়ে সবাই বলে "আঃ! কি চমৎকার!"

ছোটরাণী ভাবল, "হায় হায়! এবারে কি হবে ?" সে কাঁদতে কাঁদতে বাগানে গিয়ে আবার ডাকতে লাগল,

"এক গাছে টান দিতে বেত গাছ নড়ে,
চিল মা, চিল মা, আয় মা উড়ে!"

বলতে বলতেই চিল এসে বল্ল, "কি হয়েছে মা ? কেন ডাকছ ?"

ছোটরাণী বল্ল, "রাজা বলেছেন কাল তাঁদের সকলকে রেঁধে খাওয়াতে হবে। বড় রাণীরা সকলেই চমৎকার করে রেঁধে খাইয়েছে; আমিত কিছু জানি না মা, কি করে রাঁধব ?"

চিল বল্ল, "কোন চিন্তা নাই মা, একটু বস।" বলেই সে কোত্থেকে গিয়ে একটি ছোট হাঁড়ি নিয়ে এসে বল্ল, "এটিকে উনুনে বসিয়ে তুমি যে খাবার চাবে তাই এর ভিতর থেকে বার করতে পারবে। আর লাখ লোককে খাওয়ালেও তাতে কম পড়বে না।" বলে চিল চলে গেল।

পরদিন ছোটরাণী সেই হাঁড়িটি উনুনে চড়িয়ে তার রান্না ঘরের দুয়ার বন্ধ করে বসে রইল। খাবার সময় হলে চাকরদের দিয়ে জায়গা করিয়ে রাজাকে ডেকে পাঠাল। রাজা পাত্র মিত্র নিয়ে এসে খেতে বসলেন। ছোটরাণী পোলাও পায়েস, লুচি, সন্দেশ, যখন যা খুসী, সেই হাঁড়িটির ভিতর থেকে এনে তাঁদের পাতে দিতে লাগল। তার যে সুন্দর গন্ধ আর যে তা খেতে মিষ্টি সে আর কি বলব ? সে দিন তাঁদের যে খাওয়া হল তেমন খাওয়া তাঁদের কেহ আর জন্মেও খান নি। খেয়ে উঠেই তিনি ছোট রাণীকে পাটরাণী করে দিলেন।

এরপর আর বড়রাণীরা কিছুতেই চুপ থাকতে পারল না। তারা একদিন ছোট রাণীকে নিয়ে নদীতে স্নান করতে গিয়ে তাকে ঠেলে জলে ফেলে দিল; বাড়ীতে এসে বল্ল, "সে স্নান করতে গিয়ে জলে ডুবে মরে গেছে।"

ছোটরাণী কিন্তু মরেনি। তার চিল মা এসে তাকে ভাসিয়ে একটা বনের ধারে নিয়ে গিয়ে,

সেই বনের ভিতরে তাকে রেখে দিল। সেইখানে সে তাকে খাবার এনে দিত, একটুও কষ্ট হতে দেয়নি।

এমনি করে সেই বনের ভিতরে ছোটরাণী থাকে। তারপর একদিন রাজা সেই বনে শিকার করতে গেলেন। তখন ছোটরাণীর সঙ্গে তাঁর দেখা হল, আর কোন কথাই তাঁর জানতে বাকি রইল না। আহ্লাদে তখন তাঁর চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। তখনি তিনি ছোটরাণীকে বাড়ীতে নিয়ে এসে, মন্ত্রীকে হুকুম দিলেন যে, "বড়রাণী ছটার মাথা মুড়িয়ে, ঘোল ঢেলে, গলায় ঢোল বেঁধে, তাদের দেশ থেকে তাড়িয়ে দাও!"

আশ্বিন ১৩২০

কথাবার্ত্তা

তোমরা সকলেই অনেক পালোয়ান দেখেছ। কোন কোন পালোয়ান আজকাল মটরগাড়ি থামিয়ে বাহাদুরি দেখান, কিন্তু পিঁপড়ের গায়ের জোরের কথা যদি শোন তবে এ সব পালোয়ানকে পালোয়ান বলেই মনে হবে না। এই যে ছবি

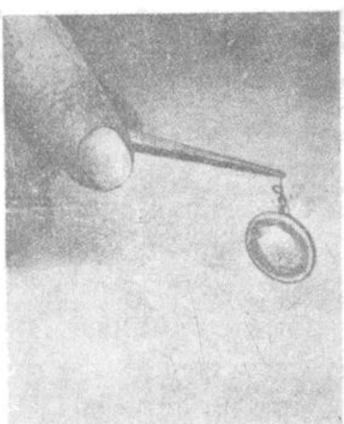

দেখছ এতে দেখান হয়েছে, একটা পিঁপড়েকে পিছনের ঠ্যাঙে চিমটে দিয়ে ধরে ঝুলান হয়েছে আর পিঁপড়েটা কামড় দিয়ে ধরে একটা টাকাকে শূন্যে ঝুলিয়ে রেখেছে। টাকাটা ওজনে পিঁপড়ের পাঁচশ গুণেরও বেশী ভারী। কোন পালোয়ান যদি এক পায়ে ঝুলে দাঁতে কামড়িয়ে এক হাজার মন ভারী জিনিস ঝুলিয়ে রাখতে পারেন, তবে তিনি পিঁপড়ের সমান বাহাদুরি নিতে পারবেন! আর একটা যে ছবি দেওয়া হয়েছে, সেটাতে দেখান হয়েছে একটা পিঁপড়ে একটা রূপোর গাড়ী টেনে নিজের গর্ত্তের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। গাড়ীটা তার চেয়ে প্রায় তের শ' গুণ ভারী। কোন

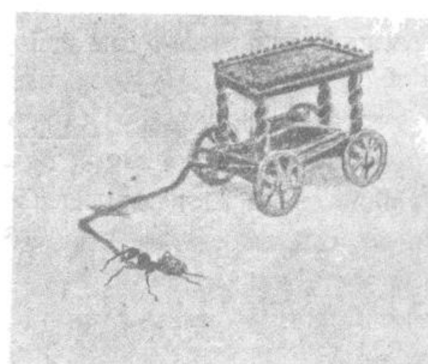

পালোয়ান কি আড়াই হাজার মন ওজনের একটা গাড়ী টেনে নিতে পারেন? একবার ভেবে দেখ দেখি, পিঁপড়েগুলো যদি মানুষের সমান বড় হ'তো তবে কী মুস্কিলই হ'তো!

বৈশাখ ১৩২০

ভবম হাজাম

(সন্দেশে প্রকাশিত সুকুমার রায়ের আঁকা প্রথম ছবি।)

কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

এক যে ছিল রাজা, সে এক ভারী প্রকাণ্ড রাজা। তাঁর হাতীশালে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড হাতী গোয়ালে গোরু আস্তাবলে ঘোড়া—কি? এ সব তো সব রাজার আছে? তা একটু আবার শোন না—তাঁর ভাঁড়ার ভরা ইঁদুর, পুকুর ভরা ব্যাং, আরো কত কিছু ছিল, আর মাথায় দুটো ছাগলের মত শিং। বেচারা রাজার ত শিং নিয়ে মহা-মুস্কিল, পাছে লোকে দেখে এই ভয়েই অস্থির। তাঁর মাথার চুল খুব লম্বা ছিল আর তার উপর প্রকাণ্ড এক মুকুট। কোন রকম করে শিংটা চাপা দিয়ে রাখতে পারলে বাঁচেন। কিন্তু চুল আর কত লম্বা রাখা যায়, তাতেও যে লোকে যা তা বলতে আরম্ভ করে। কাজেই রাজা আর কি করেন মাঝে মাঝে চুল কাটান; কিন্তু যে নাপিত যায় সে আর ফিরে আসে না? রাজা মশাই কোন একটা ছুতো নাতা করে তার মাথাটি উড়িয়ে দেন। কাজেই আর কোন নাপিত আসতে চায় না রাজার বাড়ি যাওয়ার হুকুম এলেই কোন রকমে খুর কাঁচি পুঁটলি পোঁটলা নিয়ে তাঁর দেশ ছেড়ে পালায়। শেষে এক ছোকরা নাপিত টাকার লোভে রাজার বাড়ি গেল। নাপিতের নাম ভবম হাজাম (হিন্দুস্থানি নাপিত কি না,—তারা নাপিতকে বলে হাজাম)।

ভবম এসে ত বেশ করে রাজার চুল কাটছে, এমন সময় হঠাৎ দেখে কি না রাজার মাথায়—বাপরে—এয়া বড় দুই শিং! সে ত তাই দেখে একেবারে হতভম্ব। তার পর সে কোন রকমে রাজার চুল কাটা সারল। কিন্তু বেচারার এই সব দেখে মাথা ঠিক ছিল না, সে রাজার মাথায় টিকি রাখতে ভুলে গেল। আর যায় কোথায়? রাজা বল্লেন "তবেরে বেটা বেয়াদব, আমার মাথায় শিখা রাখিসনি যে? এক্ষুনি তোর

গদ্দান নেব"।

নাপিত ত ভয়ে কাঠ। সে বল্লে "দোহাই হুজুর, এটা বড়ই ভুল হয়ে গেছে ; তবে টিকি বিশেষ করে রাজা লোকের টিকি, ও ফের খুব শিগ্‌গির গজাবে ; কিন্তু হুজুর, আমি গরিব মানুষ, আমার মাথা গেলে আর গজাবে না"—কিন্তু সে আর কে শোনে ? তার পর নাপিত অনেক হাতে পায়ে ধরল, শেষে বুঝিয়ে বল্ল যে তার মাথা কাটা গেলে আর কোন নাপিত কখনো রাজবাড়িতে আসবে না। তখন রাজা আর কি করেন, বল্লেন, "যা, কিন্তু খবর্দ্দার আমার শিঙের কথা কাউকে বলিসনে, বল্লেই তোর দফা শেষ করব"।

নাপিত ত উদ্ধ‍র্শ্বাসে দৌড় মেরে পালাল আর রাজার বাড়ির মুখোও হল না।

এখন, নাপিতের পেটে কথা থাকে না। কাজেই এই রাজার শিংয়ের কথাও ভবম নাপিতের পেটে আর থাকতে চায় না। নাপিত প্রাণের দায়ে তাকে জোর জবরদস্তি করে অনেক চেপে রাখতে চেষ্টা করল কিন্তু সে কিছুতেই চাপা গেল না, মাঝে থেকে এই ঠেলাঠেলির চোটে ভবমের পেটটা ফুলতে লাগল। দিন যায়, নাপিতের পেটও যায় যায়।

সেটা ফুলে ফুলে ঢোল, ক্রমে ঢাকাই জালা হয়ে উঠল। শেষে নাপিত তার এক নানির (দিদিমা) কাছে গেল। গিয়ে বল্লে "নানি, টাকার লোভে এক জায়গায় গিছ্‌লাম, সেখানে একটা কথা জেনেছি ; এখন তার চোটে মাথা যায় কি পেট যায়।"

নানি বল্লে "কি হয়েছে খুলেই বলনা কেন ? ভবম বল্লে "অত বলবার যো নেই, আর না বল্লেও ত দেখছ কি হচ্ছে।"

নানি তখন তাকে বলে দিল যে "সহরের মাঝে যে প্রকাণ্ড বটগাছ আছে তার কোটরে ঢুকে তোর কথাটা বলে আয়গে।" ভবম তখন গাছের কোটরে ঢুকে চুপে চুপে ব'লে এল "আরে বাসরে, রাজার মাথায় এয়া বড় দুই শিং !!" আর অমনি তার পেট ফাঁপাও সেরে গেল।

তারপর একদিন রাজার বাড়ি মহা ধূমধাম। রাজার মেয়ের বিয়ে। অনেক জায়গা থেকে কত ঢাক ঢোল কত বাজনা এসেছে। তার মধ্যে ছিল এক ঢোল সেটা সেই সহরের মাঝের বটগাছের কাঠ দিয়ে তৈরী। যখন বিয়ের আসর খুব জমেছে, বরযাত্রী এসে পড়েছে, চারিধারে লোকে লোকারণ্য, তখন সকলে শুনল রাজার নহবৎখানায় শানাই কাঁসর আর ঢোল মিলে নানান্ সুরে কি যেন বলছে। শানাই তার মিহী সুরে তান ধরেছে, 'রাজাকে দুই শিং ! রাজাকে দুই শিং !" কাঁসর অমনি ক্যান্ ক্যান্ করে বলছে "কিন্নে কহা ? কিন্নে কহা ?' (কে বলেছে, কে বলেছে), আর ঢোল গুরু গম্ভীর আওয়াজ করে বলছে "ভবম হাজাম নে, ভবম হাজাম নে" (ভবম নাপিত বলেছে) !

আর কোথা যায় ! চারিধারে হুলস্থূল—লোকে যা তা বলতে আরম্ভ করল। রাজা ত রেগে আগুন হয়ে নাপিতকে কাট্‌তে হুকুম দিলেন। কিন্তু নাপিত কি আর সেখানে থাকে ? সে সেই সর্বনেশে ঢোলের কাণ্ড দেখে আগেই কোথায় সরে পড়েছে। কাজেই, তাকে আর তখন ধরে কে ? রাজা মশায়ের লম্ফঝম্প আর শিং নাড়াই সার হ'ল।

শ্রাবণ ১৩২০

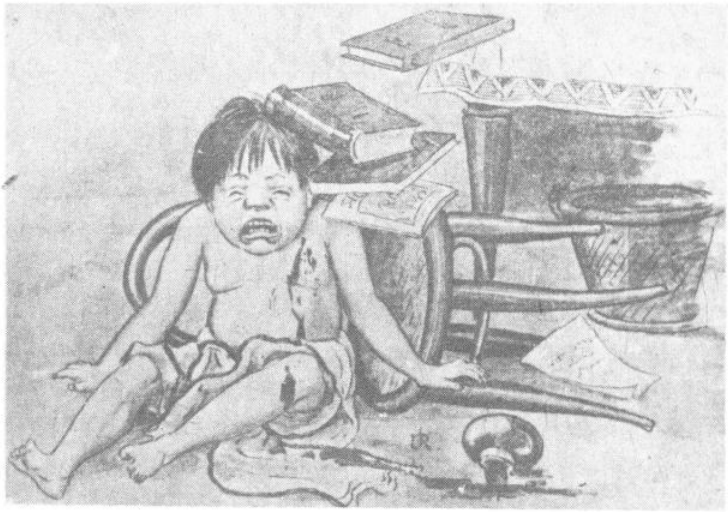

খোকাবাবুর সার্কাস

শ্রীকালিদাস রায়

বা, বা, বা হাত তালি দাও—খোকাবাবুর জয়!
দুপুর বেলা সার্কাসটা না কর্‌লেই নয়।
বীরের মতন উঠে পড়ো ঝেড়ে ঝুরে গা,
বাজি ক'রে কাঁদছ কেন মুখটী করে হাঁ।
হাস্‌বে লোকে বল্‌বে খোকার বুজরুকি সব ফাঁকা,
বোকা ব'লে কানটী ধরে মলে দিবেন কাকা।
কেউ মারে নাই, কেউ ফেলে নাই, কাঁদছো তবে কেন?
মজাই হ'লো,—সারকাস্‌টা দেখিয়ে দিলে হেন!
মাটীর উপর মারো লাথি, বোকা ঘরের মেজে,
চেয়ারটার কান মলে দাও, দুষ্ট বড় সে যে!
খোকা মোদের মজার রকম কর্‌তে গেল বাজি,
ঘরের মেজে, চেয়ার তবু হয় না কেন রাজি?
বড় হয়ে চেয়ারেতে থাকৃতে ব'সে হয়,
উঠ্‌তে গেলে, ঝুল্‌তে গেলে পড়ে যাবার ভয়।
বিছ্‌না পরে চুপটী করে শুয়ে প'ড়ে আজি,
নাক্‌ ডাকিয়ে, ঘুম ঘুমিয়ে দেখাও দেখি বাজি।

ছোট বৌ

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

এক বাড়ীতে সাতটি বৌ ছিল। সাতটি বৌ মিলে একসঙ্গে কাজ করত একসঙ্গে গল্প করত, এক সঙ্গে খেলা করত,—তাদের দিন খুব সুখেই কাট্‌ত। তার পর শ্রাবণ মাসে নাগ পঞ্চমীর দিন এল; সেদিন সে দেশের লোকেরা খুব ঘটা করে সাপের রাজার পূজা করে, আপনার লোক যে যেখানে থাকে তাদের নিমন্ত্রণ করে এনে খাওয়ায়।

সাত বৌয়ের বড় ছ জন সেদিন নিজের নিজের বাপের বাড়ী নিমন্ত্রণ খেতে চলে গেল। ছোট বৌটির বাপও ছিল না, মাও ছিল না, ভাই, মামা, কাকা, মেসো, পিসে কেউ ছিল না; সে আর কোথায় যাবে? সে ঘরের কোণে বসে কাঁদতে লাগল।

সে দিন ছিল সাপের রাজার পূজোর দিন। ছোট বৌটি কাঁদতে কাঁদতে তাই ভাবছিল আর বলছিল, "সাপের রাজা, তুমি যদি আমার মামা হতে, আর আমাকে এসে তোমার বাড়ী নিয়ে যেতে!"

এ কথা শুনে সেই মেয়েটির জন্য সাপের রাজার বড় দুঃখ হল। তিনি তখনি একটি ব্রাহ্মণ সেজে তাকে এসে বল্লেন "মনে কর, আমিই যেন তোমার মামা। আমার বাড়ী যাবে?"

ছোট বৌ জানেনা, সে ব্রাহ্মণ কে; কিন্তু তাঁর কথা তার বড় মিষ্টি লাগল। কাজেই তাঁর সঙ্গে যেতে তার কোন ভয় হল না।

সাপের রাজার বাড়ী ত এখানে নয়, তিনি থাকেন পাতালে,—মাটির নীচে। অন্ধকার গর্ত্তের ভিতর দিয়ে সে দেশে যেতে হয়। সেই গর্ত্তের মুখে এসে, তিনি যেমন সাপ ছিলেন তেমনি হয়ে, ছোট বৌকে বল্লেন, "আমিই সাপের রাজা; আমার ফণায় উঠে বসে থাক, তোমাকে আমাদের বাড়ী নিয়ে যাব।"

ছোট বৌ তাই করল। সাপের রাজা তাকে মাথায় নিয়ে সেই অন্ধকার গর্ত্তের ভিতর দিয়ে তাঁর দেশে চলে এলেন। সেখানে অন্ধকার নাই। সেখানে তাঁর সোনার পুরী মণি মাণিকের আলোয় ঝলমল করে। সেখানকার রাণী সাপ, রাজপুত্রেরা সাপ, দাস দাসী, লোকজন সব সাপ।

সাপের রাজা ছোট বৌকে এনে তাদের কাছে দিয়ে বল্লেন, "আমি এই মেয়েটির মামা হয়েছি; দেখো, যেন তোমরা কেউ একে কামড়িও না!"

সেই হতে ছোট বৌ সেইখানেই থাকে। সাপেরা তাকে খুব আদর করে, কেউ তাকে কামড়ায় না। রাণী তাকে ভালবাসেন, আর কাছে কাছে রাখেন।

তার পর একদিন রাণীর অনেকগুলি ছানা হয়েছে। রাণী তখন ছোট বৌকে বল্লেন, "একটা আলো হাতে করে এসে আমার কাছে বসে থাক।" ছোট বৌ আলো হাতে নিয়ে এসেছে, আর ভাবছে, বেশ চুপ করে রাণীর কাছে বসে থাকবে। সে জানত না যে সাপের ছানা এমন ভয়ানক কিলবিল করে! রাণীর সেই ছানাগুলোকে ঘরময় কিলবিল করতে দেখে তার এমনি ভয় হ'ল যে, আলোটা যে কখন তার হাত থেকে পড়ে গেছে, সে বুঝতেই পারল না। সেই আলোতে ছানাদের সব কটির লেজ পুড়ে গেল!

এখন উপায় কি হবে? ছানাদের লেজ পুড়ে গিয়েছে, তাদের বড্ড্ লেগেছে, রাণীরও যার পর নাই রাগ হয়েছে। হায় হায় না জানি রাজা এসে এরপর কি সাজা দেবেন! রাজা আসতেই রাণী তাঁকে সব বলে দিলেন. আর বল্লেন, "এ মেয়েকে আর আমাদের বাড়ীতে কিছুতেই রাখতে পারবে না!"

কাজেই রাজা আর কি করেন, তিনি আবার সেই রকম ব্রাহ্মণ সেজে ছোট বৌকে তাদের বাড়ীতে রেখে এলেন। ছোট বৌ ঘরে ফিরে কাজকর্ম্ম করে, আর কেবল সেই ছানাদের কথা ভাবে,—"আহা তারা ত আমার ভাই; না জানি

তারা কেমন আছে !'

তারা কিন্তু ভালই আছে, আর দিন দিন বড় হচ্ছে। খালি, তাদের লেজ যে পুড়ে গিয়েছিল, সে লেজ আর হয় নি, তাতে লোকের সামনে বেরুতে তাদের একটু লজ্জা হয়। একদিন তারা তাদের মাকে জিজ্ঞাসা করল, "হ্যাঁ মা! আমাদের লেজ কি করে এমন হল ?"

মা বল্লেন, "বাছা সকল, এক মানুষের বৌ তোমাদের লেজে প্রদীপ ফেলে দিয়েছিল, তাইতে লেজ পুড়ে অমন হয়েছে।" একথা শুনেই ত তাদের ভয়ানক রাগ হল, আর তারা বল্ল যে, "সেই মানুষের বৌকে যেমন করে পারি কামড়িয়ে মারব।"

তারপ তারা সেই ছোট বৌয়ের বাড়ী খুঁজে বার করে, তাকে বলে পাঠাল যে, "অমুক দিন আমরা তোমাকে দেখ্‌তে যাব।"

ছোট বৌ ত তা শুনে খুবই খুসী হয়েছে, কিন্তু সাপের রাণীর ছানারা ঠিক করেছে সেই সময় তারা তাকে কামড়িয়ে মারবে। ছোট বৌ তার কিছু জানে না, সে তাদের আসবার দিন তাদের কথা ভাবছে আর হাতযোড় করে দেবতাকে ডেকে বলছে, "হে দেবতা! আমার ছোট্ট ছোট্ট ভাইদের যেন কোন কষ্ট না হয়। তারা যেখানেই থাকুক তারা যেন সুখে থাকে।"

ঠিক এই সময়ে সাপের রাণীর ছানারা সেই ঘরের দরজায় এসেছে, আর ছোট বৌয়ের সব কথা শুনতে পেয়েছে। শুনে তারা ভাবল, "হায় হায়, আমাদের যে এমন করে ভালবাসে, তাকেই কি না আমরা মারতে এসেছি! সে কখনো হতে পারবে না।"

তখন তারা সবাই মিলে 'দিদি' 'দিদি' বলে এসে তার কাছে বসল, আর কত মিষ্টি মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে তাকে খুসী করতে লাগল। সারাদিন কতই আনন্দে তাদের কেটে গেল; রাত্রির বেলায় তারা দুধ খেয়ে চুপি চুপি দুধের বাটির ভিতরে ছোট বৌয়ের জন্য এক ছড়া হীরার মালা রেখে দিল। তারপর ভোর হতে না হতেই তারা কখন চলে গিয়েছে, কেউ দেখতে পায়নি। সকাল বেলায় ছোট বৌ উঠে দেখল দুধের বাটির ভিতরে কি চমৎকার মালা! তেমন মালা কেউ কখনো পরেনি, আর তাতে যে সব হীরা ছিল, তেমন সুন্দর হীরা কেউ কখনো দেখেনি। ছোট বৌ তখনি সেই মালা গলায় প'রে ছুটে গিয়ে সকলকে দেখাতে লাগল। সকলেই বল্ল, "আহা! কি চমৎকার, কি সুন্দর, কি সুন্দর!"

তারপর থেকে সাপের রাণীর ছেলেরা আর তাকে কামড়াতে আসত না, তারা সকলেই তাকে খুব ভালবাসত।

ভাদ্র ১৩২০

কথাবার্ত্তা

পুরাণে আছে যে, পৃথিবী প্রথমে জলের নীচে ছিল। তখন তাহার মাটি ছিল পাতলা লেইয়ের মত। মাটি যদি লেইয়ের মতন থাকে, তবেত ইহার পরে জীবজন্তুর সৃষ্টি হইলে তাহাদের থাকিবার বড় কষ্ট হইবে। কাজেই জীবজন্তু সৃষ্টি করিবার আগে পৃথিবীটাকে আর একটু জমাট করিয়া লইবার দরকার হইল। তখন নারায়ণ করিলেন কি, মধু আর কৈটভ নামে দুই ভয়ঙ্কর দৈত্যকে বধ করিয়া তাহাদের চর্ব্বি পৃথিবীর মাটি সঙ্গে মাখাইয়া লইলেন। তাহাতেই পৃথিবী এখন এমন মজবুত হইয়াছে। এই যে মধুকৈটভের মেদ অর্থাৎ চর্বি মাখান হইয়াছিল, এই জন্যই পৃথিবীর নাম হইয়াছে মেদিনী।

জৈষ্ঠ্য ১৩২০

জাপানী দেবতা
উপেন্দ্রকিশোর রায়

জাপানদেশে 'কোজিকী' বলে একখানা পুরানো পুথি আছে। তাতে লেখা আছে যে, এই পৃথিবীটা যখন হয়েছিল, তখন সেটা তেলের মতন পাতলা ছিল, আর ফেনার মত সমুদ্রে ভেসে বেড়াত।

তখন নাকি মোটে তিনটি দেবতা ছিলেন। এই তিনটি মরে গেলে আর দুটি হলেন; তাঁরা মরে গেলে আর দুটি,—তাঁরা মারা গেলে আবার দশটি দেবতা হলেন।

এই দশটি দেবতার একজন ছিলেন 'ইজানাগী', তার স্ত্রীর নাম ছিল 'ইজনামা'।

অন্য দেবতারা এঁদের দুজনের হাতে একটা শূল দিয়ে বল্লেন, "তোমরা এই তেলের মতন জিনিসটা থেকে পৃথিবী তয়ের কর।"

ইজানাগী আর ইজানামী বল্লেন, "আচ্ছা।" বলে তাঁরা সেই শূল দিয়ে সমুদ্রটাকে ঘাঁটতে লাগলেন। তারপর যখন শূল তুললেন, তখন তার মুখ বেয়ে যে জল পড়েছিল, তাই থেকে একটা দ্বীপ হল, তার নাম 'ওনগরো'। এই ওনগরো দ্বীপে একটি সুন্দর বাড়ী তয়ের করে, তার ভিতরে ইজানাগী আর ইজানামী বাস করতে লাগলেন। সেইখানে থেকেই তাঁরা জাপান দেশটাকে গড়েছিলেন। এই দেশকে আমরা বলি 'জাপান', কিন্তু সে দেশের লোকেরা বলে 'নিপ্পন্' বা 'দাই নিপ্পন্'।

ইজানাগী আর ইজানামীর অনেক ছেলে মেয়ে, তার মধ্যে 'আগুন দেবতা' একজন। এই দেবতার জন্মের সময় ইজানামী মরে গেলেন। তখন মনের দুঃখে ইজানাগী চোখের জল ফেলতে লাগলেন, আর সেই চোখের জল থেকে 'কান্না পরীর' জন্ম হল। কাঁদতে কাঁদতে শেষে ইজানাগীর রাগ হল। তখন তিনি তলোয়ার দিয়ে আগুন দেবতার মাথা কেটে ফেল্লেন, তাতে সেই কাটা দেবতার শরীর আর রক্ত হতে ষোলটা দেবতা উঠে দাঁড়াল।

কিন্তু ইজানাগীর মনের দুঃখ তাতেও ঘুচ্‌ল না। শেষে তিনি ইজানামীকে খুঁজতে খুঁজতে গিয়ে পাতালে উপস্থিত হলেন,—সেই যেখানে মৃত্যুর পরে সকলকেই যেতে হয়। পাতালের ভিতর মস্ত পুরী আছে, সেই পুরীর দরজায় গিয়ে ইজানামীর সঙ্গে তাঁর দেখা হল। ইজানামী তাঁকে বল্লেন, "একটু দাঁড়াও, আমি জিজ্ঞাসা করে আসি, তারপর তোমার সঙ্গে যাব।" এই বলে ইজানামী ভিতরে গেলেন। ইজানাগী খানিক বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলেন, শেষে ইজানামীর দেরী দেখে তিনিও ভিতরে গেলেন। ভিতরে যেতেই এমনি ভয়ানক গন্ধ এসে তাঁর নাকে লাগল যে কি বলব। এমন ভয়ঙ্কর নোংরা জায়গার কথা কেউ ভাবতেও পারে না; আর সেখানে থেকে থেকে ইজানামীও এমন নোংরা হয়ে গিয়েছেন যে তাঁর কাছে যাবার সাধ্য নাই। এ সব দেখে ইজানাগী নাকে হাত দিয়ে সেখান থেকে ছুটে পালালেন! পাতালের পিয়াদাগুলো তাঁকে পালাতে দেখে 'ধর ধর' বলে তাড়া করে ছিল, কিন্তু ধরতে পারে নি।

কি বিষম গন্ধই সে জায়গার ছিল; দেশে ফিরেও ইজানাগীর গা থেকে সে গন্ধ গেল না। গন্ধে অস্থির হয়ে তিনি নদীতে স্নান করতে গেলেন। সেই সময়ে তাঁর কাপড় আর গা থেকে অনেকগুলি দেবতা বেরিয়ে ছিলেন।

এঁদের মধ্যে একটি মেয়ে ইজানাগীর বাম চোখ দিয়ে বেরিয়েছিলেন, সেটি এমন সুন্দর যে তেমন আর কেউ কখনো দেখেনি। সেই মেয়েটির নাম, 'গগন আলো', তিনি সূর্যের দেবতা।

ইজানাগীর ডান চোখ দিয়ে আর একটি সুন্দর দেবতা বেরিয়েছিলেন, সেটির নাম 'চন্দ্রপতি'; আর তাঁর নাক দিয়ে আর একটি বেরিয়েছিলেন, সেটির নাম 'তেজবীর'।

তখন ইজানাগী তাঁর নিজের গলার হার

গগন আলোর গলায় পরিয়ে দিয়ে বল্লেন, "মা, তুমি হলে স্বর্গের রাণী।"

চন্দ্রপতিকে তিনি বল্লেন, "তুমি হলে রাত্রির রাজা।"

আর তেজবীরকে বল্লেন, "তুমি হলে সমুদ্রের রাজা।"

তখন গগন আলো গিয়ে স্বর্গের রাণী হলেন, চন্দ্রপতি গিয়ে রাত্রির রাজা হলেন। কিন্তু তেজবীর সেইখানে বসেই কাঁদতে লাগলেন। দিন নাই, রাত নাই, কেবলই গালে হাত দিয়ে কান্না। তাঁর দাড়ি লম্বা হয়ে ভুঁড়িতে গিয়ে ঠেক্‌ল, তবু তাঁর কান্না থামল না।

ইজানাগী বল্লেন, "আরে তোর হল কি? রাজ্য দিলাম, রাজ্যে গেলি না, খালি যে কাঁদছিস্?"

তেজবীর বল্লেন, "আমি রাজ্য চাই না। আমি সেই পাতালে আমার মার কাছে যাব।"

ইজানাগী বল্লেন, "তবে যা বেটা তুই এখান থেকে দূর হয়ে।" বলে তিনি তাঁকে তাড়িয়ে দিলেন।

তখন তেজবীর স্বর্গে গিয়ে গগন আলোর কাছে উপস্থিত হলেন। গগন আলো জানতেন, তাঁর মন ভাল নয়, কাজেই তিনি তাঁকে দেখে ভাবলেন, 'না জানি কেন এসেছে!'

তেজবীর কিন্তু বল্লেন, "বাবা তাড়িয়ে দিয়েছেন, তাই মার কাছে চলেছি। যাবার আগে তোমাকে দেখতে এলাম।"

গগন আলো বল্লেন, "তাই যদি হয়, তবে তোমার তলোয়ারখানা দাও ত।"

তেজবীরের কাছ থেকে তলোয়ার নিয়ে গগন আলো সেটাকে চিবিয়ে গুঁড়ো করে ফেল্লেন। সেই গুঁড়ো থেকে তিনটি দেবতা জন্মাল।

তখন তেজবীর বল্লেন, "আচ্ছা, এখন তোমার গহনাগুলি দাও ত।" গহনা নিয়ে তিনি চিবিয়ে গুঁড়ো করে ফেল্লেন, আর সেই গুঁড়ো থেকে পাঁচটি দেবতা হল।

এখন, এই যে সব দেবতা হল, এরা কার? গগন আলো বল্লেন, তোমার তলোয়ার থেকে যারা হয়েছে, তারা তোমার, আর আমার গহনা থেকে যারা হয়েছে, তারা আমার।

কথাটা ত বেশ ভালই বলা হয়েছিল, কিন্তু হলে কি হয়, গগন আলোর গহনা থেকেই যে বেশী দেবতা হয়েছিল, কাজেই সে কথা তেজবীরের পছন্দ হল না। তাতে তিনি বেজায় রেগে চটে গিয়ে গগন আলোর ক্ষেত মাড়িয়ে, খাল বুজিয়ে, বাগান ভেঙ্গে, বিষম দৌরাত্মি আরম্ভ করলেন।

পর্বতের গুহার ভিতরে নিজের ঘরে বসে সখীদের নিয়ে গগন আলো কাপড় বুনছিলেন, সেই ঘরের ছাত ভেঙ্গে তেজবীর ভিতরে ছাল ছাড়ান মরাঘোড়া ফেলে দিলেন।

কাজেই তখন আর গগন আলো কি করেন, তিনি তেজবীরের ভয়ে গুহার দরজা বন্ধ করে দিলেন। এখন, তিনিই হলেন সূর্য্যের দেবতা, আলোর মালিক; সেই আলোর মালিক যখন গুহায় লুকাতে গেলেন, তখন কাজেই জগৎ সংসার অন্ধকার হয়ে গেল।

সকলে বল্ল, "সর্বনাশ! এখন উপায়?" তখন তারা করল কি, তারা সবাই মিলে অনেক যুক্তি করে একখানা চমৎকার আরশী তয়ের করল, আর যারপর নাই সুন্দর এক ছড়া মণির মালা গড়াল, আরো কত কি জিনিস খুঁজে নিয়ে এল। সেই সব জিনিস আর সেই আরশী আর মালা দিয়ে গগন আলোর পূজা করে, তারপর তারা হেসে, গেয়ে, নেচে, লাফিয়ে, চেঁচিয়ে, মোরগ ডাকিয়ে, কি যে সোরগোল জুড়ে দিল, তা না শুনলে বোঝা যায় না।

গুহার ভিতরে থেকে সেই গোলমাল শুনে গগনআলো ভাবলেন, 'না জানি কি হয়েছে!" তিনি আস্তে আস্তে গুহার দরজা একটু ফাঁক করে জিজ্ঞাসা করলেন, "আরে, তোরা কিসের এত গোলমাল করছিস?"

তারা বল্ল, "গোলমাল করব না? দেখ এসে, তোমার চেয়ে কত সুন্দর একটি মেয়ে পেয়েছি!" বলেই সেই আরশীখানা এনে তাঁর সামনে ধরল।

'সেই আরশীখানা এনে গগন আলোর সামনে ধরল'

জাপানী দেবতা — উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

সেই আরশীর ভিতরে নিজের সুন্দর মুখখানি দেখে আর সূর্য্যের দেবতা লুকিয়ে থাকতে পারলেন না। তিনি তখনি ছুটে বেরিয়ে এলেন—আর অমনি সকলে গিয়ে তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করে হুড়কো এঁটে দিল।

তখন আবার সূর্য্য উঠল, আবার আলো হল, আবার সংসারে সুখ এল। তারপর সবাই মিলে সেই দুষ্ট তেজবীরকে দূর করে তাড়িয়ে দিল।

সেখান থেকে তাড়া খেয়ে, তেজবীর ঘুরতে ঘুরতে হী নদীর ধারে গিয়া উপস্থিত হলেন। সেখানে দুটি বুড়াবুড়ী একটি ছোট্ট মেয়েকে নিয়ে বসে কাঁদছিল, তাদের দেখে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমরা কাঁদছ কেন? কি হয়েছে?

বুড়াটি বল্ল, "বাবা, আমার দুঃখের কথা শুনে কি করবে? আমার আটটি মেয়ে ছিল, তার সাতটিকে অজগরে খেয়েছে, এই একটি আছে। সে বড় ভয়ঙ্কর অজগর, তার আটটা মাথা। বছরে একবার করে আসে, আর আমার একটি মেয়েকে খেয়ে যায়। আবার তার আসবার সময় হয়েছে, এবারে এটিকেও খাবে, তাই আমরা কাঁদছি।"

তেজবীর বল্লেন, "এই কথা? আচ্ছা, তোমাদের কোন চিন্তা নাই; আমি যা বলছি, তাই কর। আট জালা খুব কড়া রকমের সাকী (জাপানী মদ) তয়ের করত। করে, ঐ জায়গায় রেখে দাও, তার পর দেখ কি হয়।"

বুড়া সেই দিনই আট জালা সাকী তয়ের করে তেজবীরের কথামত সাজিয়ে রেখে দিল সাকীর গন্ধে চারদিক ভুর ভুর করতে লাগল। ঠিক সেই সময়ে অজগর গড়াতে গড়াতে আর ফোঁস ফোঁস করতে করতে এসে উপস্থিত হয়েছে, আর, সকলের আগে সেই সাকীর গন্ধ গিয়েছে তার নাকে। আর কি সে বেটা তার লোভ সাম্‌লাতে পারে? সে অমনি আট জালায় আট মুখ ঢুকিয়ে দিয়ে সাকী খেতে লাগল। খেতে খেতে চোখ বুঁজে এল, মাথা ঢুলে পড়ল, তবু তার হুঁস নাই, সে চোঁ চোঁ করে খাচ্চেই। শেষে ঘুমে অচেতন হয়ে একেবারে মাটিতে গড়াগড়ি যেতে লাগল। তা দেখে তেজবীর বল্লেন, "আর কি? এই বেলা!" বলেই তিনি তাঁর তলোয়ার নিয়ে এসে সেটাকে টুকরা টুকরা করে কেটে ফেল্লেন। তার লেজটা কিন্তু ভারি শক্ত ঠেকল। সে কিছুতেই কাটা গেল না, বরং তাঁর তলোয়ারই ভেঙ্গে গেল। তখন তেজবীর খুঁজে দেখলেন যে সেই লেজের ভিতরে আশ্চর্য্য রকমের একখানা তলোয়ার রয়েছে। তিনি তখনি সেই তলোয়ারখানা বার করে নিলেন।

তখন ত সকলেরই খুব সুখ হল। তারপর বুড়োর মেয়েকে বিয়ে করে, সেই দেশে সুন্দর বাড়ী তয়ের করে, দুজনে সুখে বাস করতে লাগলেন। আর সেই বাড়ীতে যারপরনাই আদর-যত্নে থেকে বুড়াবুড়ীর ও শেষ কাল খুব আরামেই কাটল।

গগন-আলোর যে নাতি, তাঁর ছিল তিন ছেলে; দীপ্তানল, ক্ষিপ্তানল আর তৃপ্তানল।

দীপ্তানল মাছ ধরেন আর তৃপ্তানল শিকার করেন। একদিন তৃপ্তানল দীপ্তানলকে বল্লেন, "দাদা, চলনা, তোমার কাজটা আমি করি, আর আমার কাজটা তুমি কর,—দেখি কেমন হয়।" বলে, নিজের তীর ধনুক দাদাকে দিয়ে, দাদার বড়শী আর ছিপ তিনি চেয়ে নিলেন। নিয়ে মাছ ত ধরলেন খুবই, লাভের মধ্যে বড়শীটা মাছে ছিঁড়ে নিয়ে গেল।

তারপর একদিন দীপ্তানল বল্লেন যে, "ভাই, সখ কি মিটেছে? এখন কেন আমার বড়শী আর ছিপ আমাকে ফিরিয়ে দাও না। তাতে তৃপ্তানল ভারি লজ্জিত হয়ে বল্লেন যে, "দাদা, বড়শী ত মাছে নিয়ে গেছে, এখন কি করে দিই?" এ কথায় দীপ্তানল যার পর নাই রেগে বল্লেন যে, "সে আমি জানি না; আমার বড়শী আমাকে এনে দাও।"

তখন তৃপ্তানল আর কি করেন, নিজের তলোয়ারখানা ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করে তাই দিয়ে বড়শী বানিয়ে দাদাকে দিলেন। কিন্তু দাদার তাতে মন উঠল না; তিনি বল্লেন, "ও

আমি চাই না ; আমার যে বড়শী নিয়েছ, তাই এনে আমাকে দাও !"

তৃপ্তানল হাজার বড়শী এনে দীপ্তানলকে দিতে গেলেন, তাতেও হল না। দীপ্তানল আরো রেগে গিয়ে বল্লেন, "আমার সেই বড়শীটি আমাকে এনে দিতে হবে।" তা শুনে তৃপ্তানল মাথা হেঁট করে চোখের জল ফেলতে ফেলতে সেখান থেকে চলে গেলেন। ভাবলেন, "হায় হায় ! এখন আমি কি করি ? সমুদ্রের মাছে বড়শী নিয়ে গেছে, তাকে আমি কোথায় খুঁজে পাব ?"

এই কথা ভাবতে ভাবতে তিনি সমুদ্রের ধারে গিয়ে বসে কাঁদছেন, এমন সময় সমুদ্রের দেবতা লবণেশ্বর সেইখানে এসে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার কি হয়েছে বাছা ? তুমি কাঁদছ কেন ?' তৃপ্তানল বল্লেন, "দাদার বড়শী নিয়ে মাছ ধরতে এসেছিলাম, সেটা মাছে নিয়ে গেছে। তাতে দাদা বড্ড রাগ করেছেন। আমি আর কত কাঁটা তাঁকে দিতে গেলাম, তিনি কিছুই নিলেন না, বল্লেন, আমার সেইটে এনে দাও। এখন আমি কি করি ?" লবণেশ্বর বল্লেন, "তুমি কেঁদ না, আমি যা বলছি তাই কর।" বলে, তিনি তখনি একখানা নৌকা তয়ের করে তৃপ্তানলকে তাতে বসিয়ে দিলেন, আর বল্লেন যে, "এই নৌকায় চড়ে তুমি এই এই পথ দিয়ে যেতে থাকবে। খানিক দূর গিয়ে মাছের আঁস দিয়ে গড়া একটা চমৎকার বাড়ী দেখতে পাবে, সেইখানে সমুদ্রের রাজা সিন্ধুপতি থাকেন। সেই বাড়ীর পাশে, বাগানের ভিতরে, কুয়োর ধারে একটা গাছ আছে ; তার আগায় উঠে তুমি বসে থাকবে। সেই বাগানে রাজার মেয়ে বেড়াতে আসে, সে তোমাকে তোমার বড়শীর কথা বলে দিবে।"

একথায় তৃপ্তানল সেই নৌকা বেয়ে, সেই রাজার বাড়ীতে গিয়ে সেই গাছে উঠে বসে রইলেন। খানিক বাদে রাজার মেয়ের দাসীরা কলসী হাতে করে সেই কুয়ো থেকে জল নিতে এল। এসে তারা দেখল যে গাছের উপরে কেমন সুন্দর একটি রাজপুত্র বসে আছে। তৃপ্তানল তাদের বল্লেন, "হ্যাঁ গা, তোমরা দয়া করে আমাকে একটু জল খেতে দেবে ?" দাসীরা

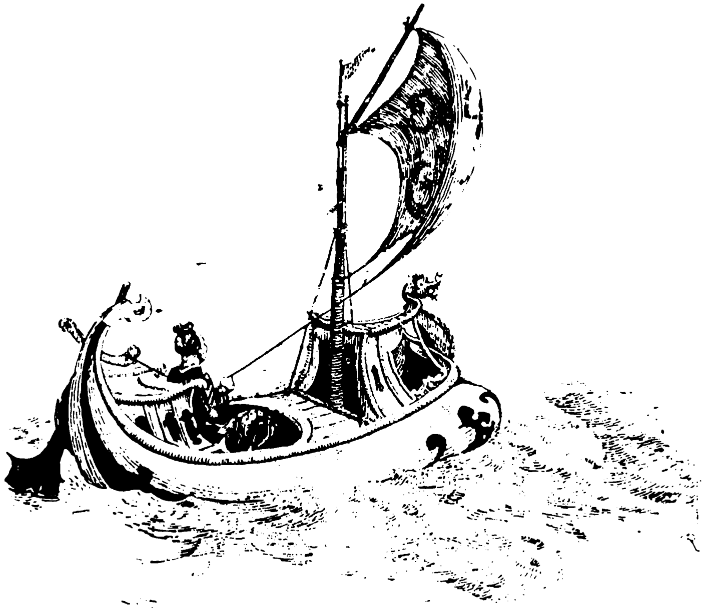

অমনি সোনার গেলাসে করে জল এনে তাঁকে খেতে দিল। তিনি তা থেকে একটুখানি জল খেলেন। তারপর গেলাস ফিরিয়ে দিবার সময় নিজের গলা থেকে মণি খুলে তার ভিতর ফেলে দিলেন। দাসীরা তা দেখতে পায়নি, তারা সেই মণিশুদ্ধ গেলাস নিয়ে রাজার মেয়ের ঘরে রেখে দিয়েছে।

তারপর রাজার মেয়ে জলখাবার জন্য গেলাশ খুঁজতে এসে বল্লেন—"এ কি? গেলাসের ভিতর মণি কোত্থেকে এলরে?" দাসীরা বল্লে, "তা ত আমরা জানি না কুয়োর ধারে একটি রাজপুত্র বসে আছে, সে আমাদের কাছে, জল খেতে চাইল, আমরা এই গেলাসে করে নিয়ে তাকে জল খেতে দিলাম। মণি হয় ত তারি হবে।"

রাজার মেয়ে তখনি ছুটে গিয়ে তাঁর বাবাকে সব কথা বল্লেন। রাজা সিন্ধুপতিও একথা শুনেই তাড়াতাড়ি সেই কুয়োর ধারে চলে এলেন। এসে সেই গাছের উপরে তৃপ্তানলকে দেখেই তিনি যার পর নাই আশ্চর্য আর খুসী হয়ে বল্লেন, "আরে, তোমার নাম না তৃপ্তানল? আমাদের স্বর্গের রাণী গগন-আলোর নাতির ছেলে! তুমি কেন কুয়োর ধারে বসে থাক্‌বে বাবা? এস, এস, ঘরে এস!" বলে, তাঁকে জড়িয়ে ধরে আদর করতে করতে রাজা তাঁকে সভায় নিয়ে এলেন। সভার লোক তাঁর নাম শুনেই ব্যস্ত হয়ে উঠে তাঁকে সেলাম করে জোড় হাতে তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে রইল। তার পর রাজা অনেক ধূমধাম করে তাঁর সঙ্গে নিজের মেয়ের বিয়ে দিলেন।

তার পর থেকে বেশ সুখেই দিন যায়। রাজা রোজই খবর নেন, তৃপ্তানল কেমন আছেন; রাজার মেয়ে বলেন 'বেশ ভাল আছেন।' এমনি করে তিন বৎসর চলে গেল। তারপর একদিন রাজা খবর নিতে এসে শুনলেন যে, তৃপ্তানল বিছানায় শুয়ে একটা খুব লম্বা নিঃশ্বাস ফেলেছিলেন।

অমনি রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, "বাবা, তুমি কেন নিশ্বাস ফেলেছিলে? তোমার কিসের দুঃখ?" তৃপ্তানল বল্লেন, "দাদার বড়শী নিয়ে মাছ ধরতে এসেছিলাম, সেই বড়শী মাছে নিয়ে গেছে। এতে দাদার বড্ড রাগ হয়েছে, আর বলেছেন যে সেই বড়শী তাঁকে ফিরিয়ে না দিলে কিছুতেই হবে না। শুনে রাজা বল্লেন, "এই কথা? আচ্ছা,—ডাকত রে সকল মাছকে!" রাজার হুকুমে পৃথিবীর যত মাছ সকলে এসে তাঁর কাছে হাজির হল, আর রাজা তাদের সকলকে জিজ্ঞাসা করলেন, "বল ত, তোমাদের কার গলায় সেই বড়শী আট্‌কে ছিল?" তারা সকলে বল্লে যে, "তাই" মাছের গলায় সেই বড়শী আটকে ছিল। আজও তার খোঁচা লাগে।" তখন রাজা মশাই তাইকে বল্লেন, "হাঁ কর ব্যাটা, দেখি তোর গলায় কি আছে!" একথায় তাই যেই 'অ-অ-অ-অ-ক্!' করে দু হাত চওড়া হাঁটি করেছে, অমনি দেখা গেল যে ঠিক সেই বড়শীটি তার গলায় বিঁধে রয়েছে। অমনি চিমটা দিয়ে সেটিকে বার করে আনা হল। তখন ত আর তৃপ্তানলের আনন্দের সীমাই রইল না। রাজা মশাই তাঁর হাতে সেই বড়শীটি দিয়ে আরো দুটি মানিক তাঁকে দিলেন। তার একটির নাম জোয়ার মানিক, তাকে ছুঁড়ে মারলে সমুদ্র ছুটে এসে শত্রুকে ডুবিয়ে দেয়। আর একটির নাম ভাঁটা মানিক; তাকে ছুঁড়ে মারলে সেই সমুদ্র ফিরে চলে যায়।

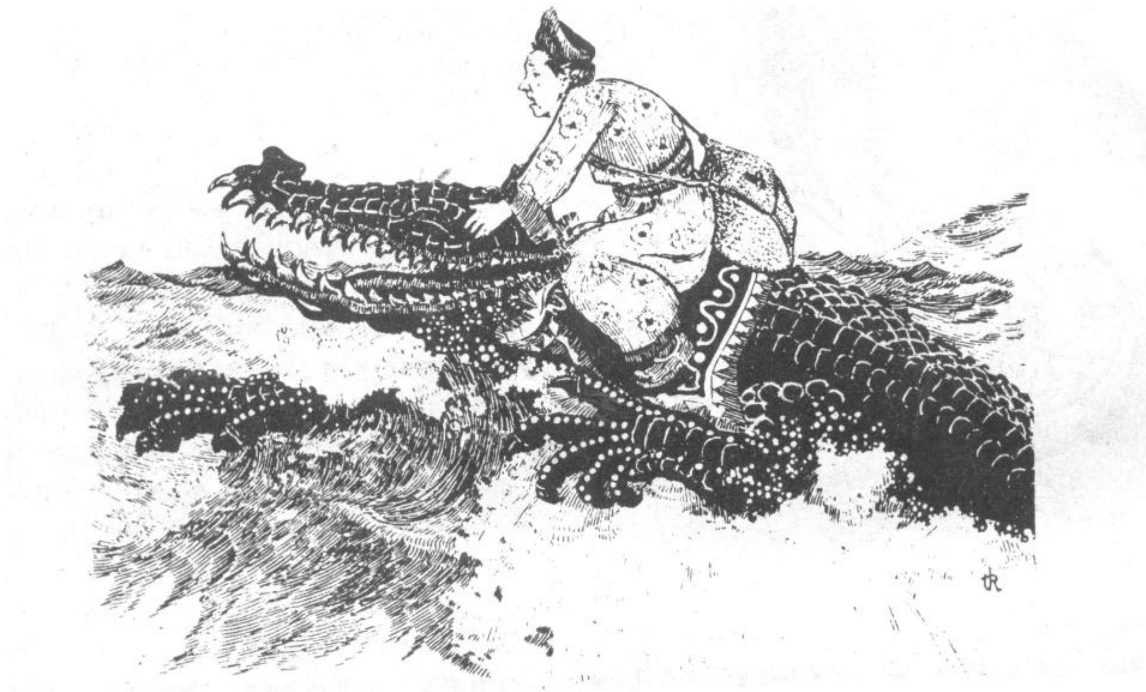

তার পর কুমীরের রাজাকে ডেকে রাজা সিন্ধুপতি বল্লেন, "তুমি তৃপ্তানলকে তার দেশে পৌঁছিয়ে দিয়ে এস। দেখো যেন তার কোন কষ্ট না হয়।

সেই পাহাড়ের মত কুমীর তৃপ্তানলকে পিঠে করে তাঁর দেশে পৌঁছিয়ে দিয়ে এল। তার পর দীপ্তানলকে তাঁর বড়শী ফিরিয়ে দিতে আর বেশীক্ষণ লাগল না।

কিন্তু দীপ্তানল কোথায় তাঁর বড়শী পেয়ে খুসী হবেন, না তিনি আরো রেগে তলোয়ার নিয়ে তৃপ্তানলকে কাট্‌তে গেলেন। তখন তৃপ্তানল আর কি করেন, তাড়াতাড়ি সেই জোয়ার মানিকটি ছুঁড়ে মারলেন। মারতেই ত সমুদ্রের জল পাহাড়ের মত উঁচু হয়ে এসে দীপ্তানলকে ভাসিয়ে নিয়ে চল্লো। তখন আর তিনি যাবেন কোথায়? চক্ চক্ করে জল খেতে খেতে চেঁচিয়ে বল্‌তে লাগলেন, "রক্ষে কর ভাই! আমার ঘাট হয়েছে, আমি আর অমন করব না।" সে কথায় তৃপ্তানল ভাটা মানিক ছুঁড়ে জল সরিয়ে দিয়ে তাঁকে বাঁচালেন।

তার পর থেকে দীপ্তানল ভাল মানুষ হয়ে গেলেন, আর ছোট ভাইকেই রাজ্য ছেড়ে দিলেন।

জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় ১৩২০

গান

উপেন্দ্রকিশোর রায়

একদিন জিব বলে 'শোন ভাই
পেটটার একটুও কাজ নাই।
খেটে মরি মোরা সবে হায়রে,
ও যে শুধু বসে বসে খায়রে।'
হাত বলে 'হাঁ হাঁ ভাই, তাইত,
পেটটার কোনো কাজ নাই ত।
ওরি জন্য কত কষ্ট সহিয়া,
মুখে তুলে ভাত দিই বহিয়া!'
পা বলিছে, 'চড়ে মোর ঘাড়ে
ব্যথা করে দিল মোর হাড়ে!
পেট যায় নেমন্তন্নে,
আমি হেঁটে মরি তার জন্যে।
আচ্ছা ভাই বল দেখি তোরা
আমি কিরে হই ওর ঘোড়া?'
শুনে সবাই রেগে বলে ভারি
'পেটের সঙ্গে কর সবে আড়ি।
সবাই খবরদার! ওর সাথে আর
কেউ কর নাক কারবার।
গলা গিলবে না, ঠোঁট খুলবে না
দিবে দাঁত কপাটি হুড়কা আঁটি
খাটাখাটি হাঁটাহাঁটি যাবে মিটি।'
এইভাবে দিন গেল দুই তিন
পেটে নাহি দানাপানি।
সবে বলে, 'ভাই, বল নাহি পাই,
মোদের কি হল জানি!
ঐ জিব দুষ্ট, সব কৈল নষ্ট
মন্দ কথা বলি কানে!'
হেন মতে সবে, কাঁদে উচ্চ রবে,
গালি দিয়া রসনারে,
'মন্দ কথা ভাই, কহিতে না চাই,
নাহি চাহি শুনিবারে!'

গণৎকার তারিণীখুড়ো

সত্যজিৎ রায়

তারিণীখুড়োর এক ভাইপো এক চা কোম্পানিতে ভাল কাজ করে, সে খুড়োকে এক টিন স্পেশাল কোয়ালিটির চা দিয়েছে। খুড়ো টিনটা আমার হাতে চালান দিয়ে বললেন, 'এটা খোলাবার ব্যবস্থা কর; আজ তোদের চা না খেয়ে এইটে খাবো।'

বৈশাখ মাসের এক রবিবারের সন্ধ্যে। দুপুরের দিকে কাল বৈশাখী হয়ে গেছে, এখন সব শান্ত। আমাদের ঘরে খুড়োর শ্রোতারা সব জমায়েত হয়েছে, তার মধ্যে অবিশ্যি ন্যাপলাও আছে। ন্যাপলা বলল, 'ভূতের গল্প অনেক হয়েছে খুড়ো; আজ একটা অন্য কিছু হোক। আপনি একবার বলেছিলেন আপনি কিছুদিন গণৎকারী করেছিলেন তখন একটা আশ্চর্য ঘটনা হয়। সে গল্প কিন্তু আজ অবধি শোনা হয়নি।'

'ও, সে গল্প বলিনি বুঝি?'

আমরা সবাই একসঙ্গে না বললাম।

খুড়ো বললেন, 'আগে ওই নতুন চা-টায় একটা চুমুক দিয়ে নিই। কাপে ঠোঁট ঠেকাতে না পারলে গল্প খোলেনা।'

পাঁচ মিনিটের মধ্যেই চা এসে গেল, ভুরভুরে সুগন্ধ, খুড়ো ওই গরম চাতেই একটা চুমুক দিয়ে বললেন, 'বাঃ, খাসা চা।' তারপর একটা এক্স-পোর্ট কোয়ালিটি বিড়ি ধরিয়ে নিয়ে গল্প আরম্ভ করলেন।

ঘটনাটা ঘটে নাগপুরে। আমি বোম্বাই গেস্‌লাম যদি ফিল্মে কিছু কাজ পাওয়া যায়। তার মানে মনে করিসনা যে আমার ফিল্মে অভিনয় করার ইচ্ছে ছিল। তা নয় মোটেই। আমি প্রোডাকশন ম্যানেজারের কাজটা ভালো জানতাম; টালিগঞ্জে দুটো ছবিতে ওই কাজ করেছি, তাই সেই দিকেই চেষ্টা করছিলাম। একটা ছবিতে কাজ জুটেও গেল।

আমি থাকি ভিলে পার্লেতে একটা দোতলা বাড়ির একতলায় একটা ছোট ফ্ল্যাটে। পুরো দোতলাটা নিয়ে থাকেন বম্বের এক বিখ্যাত জ্যোতিষী মুকুন্দ পটবর্ধন। দিশি মতে হাত দেখিয়ে হিসেবে তার খুব নাম ডাক। আমার প্রতিবেশী, তাই আমার সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল। কেন জানিনা, ভদ্রলোকের আমাকে খুব ভালো লেগে গেল। বললেন, 'তোমাকে আমি পামিস্ট্রি শিখিয়ে দেব।'

যে কথা সেই কাজ। কাজের পর রাত্তিরে ভদ্রলোকের ঘরে বসে হস্তরেখা গণনা শিখতে আরম্ভ করলাম। অদ্ভুত সাবজেক্ট। নেশা ধরে গেল। দু মাসের মধ্যে দেখি আমিও বেশ হাত দেখতে পারছি। স্টুডিওর কয়েকজনের হাত দেখে অতীত ভবিষ্যৎ বলে দিলাম, এক প্রোডিউ-সারের ছবি হিট হবে সেটা বলে দিলাম, আর ফলেও গেল।

শেষটায় একটা সময় এল যখন মনে হল আমি নিজেই এ কাজ করে রোজগার করতে পারি। এক কাজে বেশি দিন টিঁকতে পারিনা সেটা ত তোদের বলেইছি, তাই ফিল্মের লাইন ছেড়ে পামিস্ট্রি ধরলাম। কিন্তু বম্বেতে নয়। বম্বেতে এ কাজে পটবর্ধন একচ্ছত্র অধিপতি। আমাকে অন্য জায়গা দেখতে হবে। চলে গেলুম নাগপুর। পাচপাওলি অঞ্চলে রাস্তার ওপর একটা ঘর নিয়ে দরজার পাশে নোটিশ লটকে দিলুম—'এখানে সুলভে হস্তরেখা দেখে ভবিষ্যৎ গণনা করা হয়। বেঙ্গলের বিখ্যাত গণৎকার' ইত্যাদি।

দেখতে দেখতে পসার জমে উঠল। এরকম র‍্যাপিড সাক্সেস হবে তা আশা করিনি। এক বছরের মধ্যে একটা বড় ফ্ল্যাটে উঠে যেতে হল,

একটা বি. এ. পাশ ছোক্‌রা সেক্রেটারি রাখতে হল। সারা ভারতবর্ষ থেকে হাতের ছাপ আসে, সেই ছাপ দেখে আমি ইংরাজিতে গণনা করি, সেক্রেটারি সেগুলো টাইপ করে যথাস্থানে পাঠিয়ে দেয়। বেশির ভাগ মক্কেলই হচ্ছে ব্যবসাদার, আর তাদের মধ্যে বেশির ভাগই মারোয়াড়ি। মাসে রোজগার তখন আমার প্রায় তিন হাজার টাকা, আর আমার বয়স তখন বত্রিশ তাহলে কদ্দিন আগের কথা বুঝতেই পারছিস।

এর মধ্যে একদিন এক ভদ্রলোক এলেন, ফরসা একহারা চেহারা, চোখে চশমা, পরণে বিলিতি পোষাক। বয়স আন্দাজ বছর ত্রিশেক। তিনি তাঁর হাতটা দেখিয়ে বললেন, 'আমি শুধু একটা জিনিস জানতে চাই। আমি একটা নতুন চাকরিতে জয়েন করছি। সে কাজটা ঠিক হচ্ছে না ভুল হচ্ছে?'

আমি হাতের রেখা দেখে বললাম, 'যা করতে যাচ্ছ করো। তোমার নতুন চাকরিতে উন্নতি হবে।'

'ভেরি গুড,' বললেন ভদ্রলোক। 'এবার আমি তোমাকে একটা জিনিস দেখাতে চাই।'

আমি আগেই লক্ষ করেছিলাম যে ভদ্রলোকের কাঁধে একটা নকসাদার কাপড়ের ব্যাগ ঝুলছে। ভদ্রলোক তার মধ্যে থেকে একটা বেশ বড় খাম বার করে তার ভিতর থেকে এক শীট কাগজ টেনে বার করলেন। কাগজটা পুরোনো তা দেখলেই বোঝা যায়। সেই কাগজে রয়েছে কালো কালিতে একটা রেখা সমেত হাতের ছাপ। ভদ্রলোক সেটা আমার দিকে এগিয়ে দিলেন। কাগজের উপর দিকে ডান কোনায় একটা তারিখ লেখা রয়েছে সেটা পনের বছর আগের।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'এটা কার হাতের ছাপ?'

'আমার বাবার,' বললেন ভদ্রলোক। একটা পুরোন বাক্স ঘাঁটতে ঘাঁটতে বেরিয়ে পড়ল। মনে হয় এটা উনি নিয়েছিলেন বম্বের গণৎকার পটবর্ধনকে পাঠানর জন্য। কিন্তু ঘটনাচক্রে সেটা আর হয়ে ওঠেনি।'

'আমাকে কি এখন এই হস্তরেখা দেখে গণনা করতে হবে?'

'হ্যাঁ। বিশেষ কয়েকটা তথ্য।'

'আপনার বাবার বয়স তখন কত ছিল?'

'পঞ্চাশ।'

আমি হাতের রেখা বিচার করে একটা অদ্ভুত তথ্য আবিষ্কার করলাম। ভদ্রলোকের মৃত্যু হয়েছে ওই পঞ্চাশ বছর বয়সেই। সেটা আমি বললাম আমার মক্কেলকে।

'স্বাভাবিক মৃত্যু কি?' জিজ্ঞেস করলেন মক্কেল।

আমি আবার ভালো করে দেখলাম ছাপটা। তারপর বললাম, 'রেখা স্পষ্ট বলছে অপঘাত মৃত্যু, স্বাভাবিক নয়।'

'এ বিষয় আপনি নিশ্চিত?'

'অ্যাবসোলিউটলি,' আমি জোর দিয়ে বললাম।

'তাহলে আপনাকে ঘটনাটা একটু খুলে বলি,' বললেন ভদ্রলোক। 'আমার বাবার নাম ছিল প্রকাশচন্দ্র মাথুর। আমি বাবার একমাত্র সন্তান। আমার মা আমাকে জন্ম দিতে মারা যান; আমি মানুষ হই এক বিধবা পিসির কাছে। আমার নাম সুরেশ মাথুর। বাবা ব্যবসাদার ছিলেন। বাবার একজন অংশিদার ছিল, নাম গজানন আপ্টে। আজ থেকে পনের বছর আগে—তখন আমার বয়স সতের—বাবা একটা বিশেষ কারণে খুব কষ্ট পান। বাবাকে এত বিচলিত হতে আমি কখনো দেখিনি। আমি কারণ জিজ্ঞেস করতে বাবা বলেন, 'যাকে আপনার জন বলে মনে করা যায়, সে যদি বিশ্বাসঘাতকতা করে তাহলে যত কষ্ট পেতে হয় তেমন আর কিছুতে হয় না।' আমার স্বভাবতই বাবার বিজনেস পার্টনারের কথা মনে হয়; কিন্তু বাবা এই নিয়ে আর কিছু বলতে চান না। এর কিছুদিন পরেই একদিন বিকেলে আপিসে বাবাকে চেয়ারে বসা অবস্থায় তাঁর

টেবিলের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে থাকতে দেখা যায়। তখনই ডাক্তার ডাকা হয়। ততক্ষণে বাবা মারা গেছেন। ডাক্তার বলেন হার্ট অ্যাট্যাক। আমার ইচ্ছা ছিল পুলিশ ডাকার, কারণ আমার সন্দেহ হয়েছিল বাবাকে হত্যা করা হয়েছে। বাবা তাঁর অংশিদারের কীর্তি ধরে ফেলেছেন, তাই তাঁকে মেরে তাঁর মুখ বন্ধ করা হয়েছে। কিন্তু আমার তখন মাত্র সতের বছর বয়স—আমার কথা কে শুনবে? আজ আপনার গণনায় জানতে পারছি যে আমার ধারনাই ঠিক ছিল, বাবাকে খুনই করা হয়েছিল।'

আমি বললাম, 'যাই হোক, যা হবার হয়ে গেছে। এতদিন আগের খুনের ব্যাপারে আজকে ত আর তুমি কিছু করতে পারবে না।'

সুরেশ মাথুর ধন্যবাদ দিয়ে আমার পারিশ্রমিক চুকিয়ে দিয়ে চলে গেল।

এই ঘটনার প্রায় ছমাস পরে একদিন হঠাৎ আমার কাছে এক মক্কেল এসে হাজির, বছর ষাট্-বাষট্টি বয়স, ঘী খাওয়া চেহারা, বললেন তিনি একজন ব্যবসাদার, একটা নতুন ব্যবসায়ে টাকা ঢালতে যাচ্ছেন, তার ফলাফল কী হবে সেটা জানতে চান। সামনে তাঁর কোনো আর্থিক বিপর্যয় আছে কি?

আমি জিজ্ঞেস করতে বললেন তাঁর নাম গজানন আপ্টে। আমি ত শুনে অবাক।

যাই হোক, মক্কেল যখন, তখন তাঁকে অ্যাটেণ্ড করতেই হবে। আমি তাঁকে আমার ফরাসে বসালাম। তারপর আমার একটা প্রশ্ন ছিল সেটা করলাম।

'আপনার বয়স কত?'

ভদ্রলোক বললেন, 'ছেষট্টি।'

আমি হাতের রেখার দিকে মন দিলাম। দেখি যে নতুন ব্যবসা ফাঁদার কোনো প্রশ্ন আসছে না। এই বছরই ভদ্রলোকের মৃত্যু এবং সেটা অপঘাত মৃত্যু। সেকথা ত আর তাঁকে বলতে পারি না; বললাম, 'তোমার নতুন ব্যবসায়ে টাকা ঢেলে কোনো সুফল হবে না; তুমি যা করছ তাই করো।'

'তুমি ঠিক বলছ?' ভদ্রলোক আবার প্রশ্ন করলেন। 'আমি কিন্তু অনেক ভেবে চিন্তে এই পন্থা স্থির করেছি।'

আমি ভদ্রলোককে আবার বারণ করলাম। তাঁর হাতের তেলো আমার সামনে খোলা, আমি তখনও মনে মনে গণনা করে চলেছি। হঠাৎ একটা ব্যাপার দেখে আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম।

ভদ্রলোকের হাতে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে তিনি পনের বছর আগে একটা খুন করেছেন। সাংঘাতিক ফাঁড়া, কিন্তু সে ফাঁড়া তিনি কাটিয়ে উঠেছেন সেকথাও হাতে রয়েছে।

আমি অবিশ্যি এ বিষয় আর কিছু বললাম না। ভদ্রলোক আমাকে টাকা দিয়ে আমার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। আমি আবার বলে দিলাম যে নতুন ব্যবসায় টাকা ঢেলে কোনো ভালো ফল হবে না।

এর সাতদিন পরে সুরেশ মাথুর আবার এসে হাজির। আমি বললাম, 'কী ব্যাপার?'

মাথুরকে বিশেষভাবে উত্তেজিত বলে মনে হচ্ছিল। সে বলল যে এর মধ্যে নাকি গজানন আপ্টের আপিসে গিয়েছিল। আপ্টে ছিলেন না কিন্তু তাঁর সেক্রেটারি ছিল। সেটা জেনে শুনেই নাকি মাথুর গিয়েছিল। সেক্রেটারি নাকি বিশ বছর ধরে ওই আপিসে চাকরি করছে। তার সঙ্গে কথা বলার দরকার ছিল মাথুরের। মাথুর তাকে তার বাপের মৃত্যুর কথা জিজ্ঞেস করে। সেক্রেটারি বলে তার ঘটনাটা পরিষ্কার মনে আছে। সে প্রকাশ মাথুরের বিশেষ অনুরক্ত ছিল। সে বলে বিকলে কফি খাবার পরই নাকি প্রকাশ মাথুর মারা যান। সেক্রেটারি সন্দেহ করেছিল যে কফিতে বিষ মেশানো হয়েছে, কিন্তু ডাক্তারের মুখের উপর সে কোনো কথা বলতে পারেনি।

'তাহলে এখন তোমার কি মতলব?' আমি সুরেশ মাথুরকে জিজ্ঞেস করলাম।

সুরেশ চাপা স্বরে বলল, 'আমি বাবার মৃত্যুর প্রতিশোধ নেব।'

'সে কি? কী করে?'

'যে করে হোক।'

আমি যে ইতিমধ্যে গজানন আপ্টের হাত দেখেছি আর জেনেছি যে তাঁর আয়ু ফুরিয়ে এসেছে, সে বিষয় আর কিছু বললাম না। সুরেশ মাথুর প্রতিশোধের সংকল্প নিয়ে আমার আপিস থেকে বেরিয়ে গেল।

এর তিন দিন পরে খবরটা খবরের কাগজে বেরোল। গজানন আপ্টে খুন হয়েছেন। তিনি ইটওয়ারি রোডে থাকতেন, রোজ সন্ধ্যায় আপিসের পর জুমা তালাও-এর পাশে হাঁটতে যেতেন। সেই হাঁটা অবস্থায় পিছন থেকে কেউ এসে তাঁকে কোনো ভারি অস্ত্র দিয়ে মাথায় মেরে খুন করেছে। পুলিশ আততায়ীর অনুসন্ধান করছে।

কিন্তু আমি ত সুরেশ মাথুরের হাত দেখেছি। আমি জানি তার এখন একটা ফাঁড়া আছে, কিন্তু এ ফাঁড়া সে কাটিয়ে উঠবে।

শেষ পর্যন্ত হলও তাই। পুলিশ খুনীকে ধরতে পারল না, এবং গজানন আপ্টের খুন 'আনসল্‌ভ্‌ড্‌ ক্রাইম্‌স্‌'-এর পর্যায়ে ফেলে দেওয়া হল।

সুরেশ মাথুর যে শুধু পারই পেল তা নয়। আমি জানি যে বিরাশি বছরের আগে তার মৃত্যু নেই, এবং সে মৃত্যু স্বাভাবিক মৃত্যু।

অন্তত তার হাতের রেখা তাই বলে।

শিবুদার চতুর্থ বিস্তার

লীলা মজুমদার

ভুটের শিবুদার কথা শুনে মনে হয় দুনিয়ার যত অদ্ভুত অত্যাশ্চর্য অবিশ্বাস্য এবং অসম্ভব অভিজ্ঞতা কোনো না কোনো সময়ে তাঁর আয়ত্তের মধ্যে এসেছিল। এ কথা বললে অবিশ্যি তিনি বেজায় চটে যান। বলেন—তা তোদের মনে হতে পারে অত্যাশ্চর্য অদ্ভুত—কি—ই বা জানিস্, তার কতটুকুই বা বুঝিস্? তোদের ঐ সব বাপ-ঠাকুরদারা যে-সব জানে না বলে বলেনি আর তোদের কবিগুরুর ঐ রাশিরাশি বইতে যা লেখা হয়নি, অমনি সে-সব নেই হয়ে গেছে বলতে চাস্? রোবট দেখেছিলেন তাঁরা? চাঁদের মাটিতে পা ফেলেছিলেন?' ভুটে রেগে বলল, 'তুমি ফেলেছ?'

শিবুদার ভারিক্কে হাসিটা যে দেখে তারি হাড়পিত্তি জ্বলে যায়। তিনি বললেন, 'তা একরকম বলতে পারিস্ নেবেছি। তবে বোধ হয় আমাদের এই চেনা পুরনো চাঁদটাতে নয়, এ আর এমন কি? হামেশাই যাওয়া-আসা হয়। নাকি আন্তর্জাতিক ঘাঁটি বসবে। আমি যার কথা বলছি, সে প্রায় এক অগম্য স্থানে।'

বটা বলল, 'তাই নাকি? তারা বোধহয় এক-বারটি তোমার চাঁদমুখ দেখেই কোলপাঁজা করে আবার ফেরত দিয়ে, হাত ধুয়ে, চলে গেল?'

শিবুদা রাগ করলেন না। গম্ভীর হয়ে বললেন, 'মুখ্যুদের আর কি বলে বোঝাব? বিজ্ঞানের কয়েকটা প্রাথমিক নিয়ম আছে, তাও হয়তো জানিস্ না?' ওরা চটে বলল 'জানি, জানি, মাধ্যাকর্ষণ শক্তি, তাই গাছ থেকে আপেল পড়ে যায়, কিন্তু পাকা পেয়ারা পড়ে না। তার আগেই বাদুড়ে খেয়ে ফেলে। তাছাড়া তিনটে বিস্তার আছে লম্বা চওড়া উচ্চতা হুঁঃ।'

শিবুদা কপাল চাপড়ে বলে উঠলেন, 'হায় হায়! ঐ বিদ্যে নিয়েই আমারো প্রায় কাল হয়েছিল। ভাগ্যিস সঙ্গে ঠাকুরদার সর্বশংকাহরণ চাবিটি ছিল, তাই বাঁচোয়া। নইলে আমাকে তোরা অকালে হারাতিস্!' হারুটা বেশ হৃদয়-হীন ভাবে বলল, 'এমন কিছু অকালেও নয়, শিবুদা কাগজে দেখেছিলাম আমাদের দেশে গড়ে আয়ুর হার হল ৬০ বছর। তুমি তা ছাড়িয়ে গেছ।' শিবুদা চোখ বুজে বিড়বিড় করে বোধ

হয় ওর ধৃষ্টতা ক্ষমা করে উঠে পড়লেন। সঙ্গে সঙ্গে ওরা পাঁচজন যে যেখানে পারে ধরে টেনে ওঁকে আবার বসিয়ে দিয়ে বলেছিল, 'সেটি হচ্ছে না শিবুদা, আমরা তোমার ভক্ত অনুচর, গল্পটি না শুনে ছাড়ছি না। কি ভাষায়, কি কাল্পনিকতায় তুমি সবাইকে হার মানিয়েছ। তা ছাড়া সত্যি বৈজ্ঞানিক গল্প বললে আমরা চাঁদা করে তোমাকে তেওয়ারির কুলপি মালাই খাওয়াব। আমাদের জ্ঞানও বাড়বে।'

শিবুদা বললেন, 'বুঝলি, গত শীতকালের ব্যাপার। ভজুদের বাড়িতে নেমন্তন্ন খেয়ে ফিরতে বেশ দেরি হয়ে গেছিল। পথঘাট শুনশান; তারাগুলো মনে হল বড্ড বেশি নিচে নেমে এসেছে; অমাবস্যাটস্যাও হতে পারে, চাঁদের দেখা নেই, কিন্তু চারদিকটা তারার আলো ফুটফুট করছে। সেই আলোতে মনে হল ছাই রঙের পোশাক পরা একটা বেঁটে রোগা লোক পথের ধারে কি যেন হাতড়ে বেড়াচ্ছে। জিগ্গেস করলাম, 'কি খুঁজছ?' চমকে উঠে সোজা হয়ে দাঁড়াতেই দেখলাম সে রোগাও নয়, বেঁটেও নয়; মিচ্‌কেপানা মুখে বলল 'দেখ তো, আমার চাবিটে কোথায় দেখতে পাও কি না।' বললাম, 'অত খোঁজার কি দরকার? আমার কাছে একটা চাবি আছে তাই দিয়ে দুনিয়ার সব জিনিস খোলা যায়। সর্বশংকাহরণ তাছাড়া আবার কি?' লোকটা কাষ্ঠ হেসে বলল, 'শুধু সব বাক্স প্যাঁটরার চাবি খুললেই হবে না হে, আমার চাবি দিয়ে সৃষ্টির সব রহস্যও উদ্ঘাটন করতে পারা চাই। নইলে আর আমাদের অণুঅনরোণিয়নের অমন সুন্দর আবাসটি ছেড়ে তোমাদের এই নোংরা মুলুকে আসব কেন?'

বেজায় রেগে গেলাম, 'তোমাদের দেশে ময়লা নেই বলতে চাও? একবারটি দেখে আসতে ইচ্ছে করে।'

লোকটি ফিক্ করে হেসে বলল, 'তোমার ঐ সব-তালা খোলে চাবিটে দাও তো একবার দেখাতে পারি, কিন্তু নিয়ে যেতে পারব না। আচ্ছা আমার চোখের দিকে তাকাও তো।' আমি আশ্চর্য হয়ে ওর চোখের দিকে যেই তাকালাম, অমনি মনে হতে লাগল আমি বদলে যাচ্ছি, ছোট হয়ে যাচ্ছি, আরো ছোট হয়ে যাচ্ছি। পায়ের তলার বালিগুলো যেন তেমনি বড় থেকে আরো বড় হয়ে যাচ্ছে। তাদের গায়ের বড় বড় ফাঁক দেখতে পেলাম। তারি একটা দিয়ে ভেতরে পড়েও গেলাম। হয়তো একটু মুচ্ছো গিয়ে থাকব, দুম করে কোথাকার মাটিতে পড়ে চৈতন্য ফিরে পেয়ে চেয়ে দেখি আমি একটা ফিকে হলুদ ঘেসোমাঠে পড়ে আছি। মাথার উপর গাঢ় নীল আকাশ, তাতে অগণ্য অচেনা তারা জ্বলছে, নিবছে। এ আমি কোথায় এলাম? ভয়ে পেটে হাত পা সেঁদিয়ে গেল। খচর মচর শব্দ শুনে চেয়ে দেখি বড় বড় গিরগিটি খিদেখিদে মুখে ঘাস খাচ্ছে। দূরে কতকগুলো গোল ছাদের বাড়িও আছে। ভাঙা গলায় চেঁচিয়ে উঠলাম 'বাঁচাও! বাঁচাও! মহা গিরগিটিতে খেলে রে!' অমনি ধপাস্ করে কোথায় যেন এসে পড়লাম!

চোখ খুলে তাকাতেই লোকটি হাত পেতে বলল 'দেখা হল তো? এবার সব-তালা-খোলার চাবিটে দাও দিকি। মনে মনে যখন আমার দেশে গেলে, তখনি স্বচ্ছন্দে তোমার পকেট থেকে চাবিটে নিতে পারতাম, নেহাৎ গুরুদেবের বারণ আছে। দাও তো বাছা।'

'দিয়ে দিলাম চাবিটে তখন আমার চাবি তৈরির ব্যবসা ছিল, ভাবলাম না হয় ঐ রকম আরেকটা বানিয়ে নেব। তারপর এই বইয়ের দোকানের চাকরিটে পেয়ে যাওয়াতে ও-সব কষ্টের কাজ ছেড়ে দিলাম। তাছাড়া বিবেক বড় দংশন করত। পরদিনের কাগজে দেখেছিলাম কে বা কারা আমাদের পাড়ার বড় ব্যাংকের রাত-পাহারাদের মন্তর করে ঘুম পাড়িয়ে, স্ট্রং রুম খুলে বহু ধনরত্ন নিয়ে, আবার দরজাটা যেমনকে তেমন বন্ধ করে চলে গেছে। সকালে চাবির দোকান খুলতে গিয়ে দেখি দরজার চৌকাঠের ওপর চাবিটে পড়ে আছে। সেটা গঙ্গায় ফেলে দিয়েছি। লোভ বড় পাপ।'

এই বলে গুপিদা টপ করে উঠে পড়ে দরজার দিকে রওনা দিলেন। ভুটে খালি ওঁর কাছা ধরে টেনে বলল, 'শুধু বলে দাও অণুঅনরোণিয়ন কথাটা শিখলে কোত্থেকে?' 'শিখলাম রবীন্দ্রনাথের বই পড়ে। এই বিদ্যে নিয়ে তোদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার! বিজ্ঞান পড়্, দিক্‌জ্ঞান হবে। এই সৌর মণ্ডলের মতো মহাকাশে যে শুধু কোটি কোটি সৌর মণ্ডল আছে তা নয়। প্রত্যেকটা ধুলোর কণার মধ্যে দেখা গেছে একটা কেন্দ্র-বিন্দুর চারদিকে খুদেখুদে অনুকণা কেবলি ঘুরছে। তাকেই বোধহয় বলে অণুঅনরোণিয়ন। ও বিষয়ে আর জিগেস করিস্‌নে, তাহলে আমি নিশ্চয় মুচ্ছো যাব।' এই বলেই পিট্টান দিলেন।

ইর-মিকির

মহাশ্বেতা দেবী

ইর্-মিকির্ শব্দ দুটোর কোনো মানে আছে কি না আমি এখনো জানি না, তার মানে কিন্তু এই নয়, যে মানে নেই। সব কিছু তো আমরা জানতে পারি না, তা বলে কি তার মানে নেই? এই তো সেদিন, কুল গাছের গুটি থেকে যে অপরূপ প্রজাপতিটা বেরোল, তথাগত তাকে চাপা দিয়ে রেখে দিতে চাইছিল। আমরা অবশ্য তাকে উড়িয়ে দিলাম। কিন্তু তথাগত কেন ও রকম জেদ করছিল তারও মানে ছিল। প্রজাপ্রতিটা ভালো করে দেখে না নিলে ও আঁকবে কেমন করে?

কোথায় তথাগত, কোথায় ইর্-মিকির!

ইর্-মিকিরের কথা আমি জানতেই পারতাম না, যদি না ঝড়জলে লাইনে গাছ পড়ে ট্রেনটা আটকে যেত, আর ছাউ নামে একটা ছোট্ট বাজার-হাট ওয়ালা স্টেশনে নামতে হত। সেখানে রাত কাটাতে হয়েছিল এমন জায়গায়, যে ভাবতে গেলে এখন অবাক লাগে। হোটেল সেখানে কোথায়? কিন্তু চায়ের দোকান যেটা, সেখানেই বাসের ড্রাইভাররা খায়! বেঁচে থাকুক বাস সার্ভিস। ওদের জন্যেই সব জায়গায় ধাবা পাওয়া যায়। ছাউয়ের ধাবাতে খুব ঝাল চানার তরকারি, রুটি আর পেঁয়াজ খেয়েছিলাম।

লাইনে গাছ পড়েছে দুটো। ঝড়জল খুবই হয়েছে। অনেক জিজ্ঞেস করে জানা গেল পর দিন সকালের আগে ভরসা নেই। তবে ধাবার লোকরা বলল, সকালে রামগড় যাবার বাস পাওয়া যাবে। তাতে আমি করমগড়ে নামতে পারব। সেখান থেকে দুহাপুর মাত্রই তিন মাইল। ট্রেনে গেলেও হাঁটতেই হত।

ধরমনাথের সঙ্গে ওদের গ্রামেই যাচ্ছি। ধরমনাথ খেয়েদেয়ে ছাউ স্টেশনের প্ল্যাটফর্মেই শুয়ে পড়ল অন্যদের সঙ্গে। আমরা ঢুকলাম একটা ঘরে। যেটাতে জানলা-দরজা বসে নি। স্টেশন বড় করা হচ্ছে, ওটা যাত্রীদের বসবার ঘর হবে।

মোমবাতির মতো সাদা, লম্বাটে, পাকাচুল আর ঝাঁকড়া ভুরু একটি লোক এতক্ষণ খুব সাহায্য করেছে আমাদের, কিন্তু ধাবায় ওকে খেতে দেখিনি। ওকে সবাই "টিশনবাবু" বলছিল। জিগ্যেসও করেছিলাম, আপনি কি স্টেশনে কাজ করেন? ও একটু লাজুক হেসে বলেছিল, না না। এই ঘুরি ফিরি, যাত্রীদের

দেখভাল করি। লাইনটা খুব খারাপ, জানেন? ঝড় উঠলেই গাছ পড়বে, নয়তো পাহাড় থেকে পাথর গড়াবে, গাড়ি আটকাবে।

ধরমনাথ পরে বলে গেল, লোকটা পাগলাটে আছে। ওষুধ কোম্পানির কাজ করত। কাজ-কর্ম ছেড়ে ছাউতে পড়ে আছে কত বছর। লেখাপড়া জানে। লোকজনকে চিঠি লিখে দেয়। ধাবাতে হিসাব রাখে, খেতেও পায়। কিন্তু মাঝে মাঝে উধাও হয়ে যায়। বর্ষাকাল এল, তো খ্যাপামি বাড়ল।

—নাম কি?

—টিশনবাবু বলে সবাই। আসল নাম মোহনলাল প্রসাদ। কিন্তু সে নামে ডাকলেও সাড়া দেয় না।

—মাথার দোষ আছে?

—জানলে জানবে মোতিয়ার মা। সেই ওর খোঁজ খবর রাখে, যত্ন করে। কিন্তু তার বাড়িতেও ও থাকে না।

অসমাপ্ত সেই ঘরে শোবার জায়গা পাই নি। দেওয়ালে হেলান দিয়ে ভাবছিলাম, এ রকম একটা লাইন আছে, পাহাড়ের ঢালে উঠছে নামছে সে তো লাপড়ার পর দেখিনি। বাইরে খুব বাতাস চলছিল, ঠাণ্ডা জোলো বাতাস। ছাউ থেকে পাহাড় অবধি গাছপালা তখন তো ছিল। এখনকার কথা বলতে পারব না। খুব ভালো লাগছিল সবটা। তখনো ও সব জায়গায় চুরি-ডাকাতি কম হত। ট্রেনে চাপত গ্রামের আদিবাসী আর অন্য মানুষরা। খুব ফল পাওয়া যেত কয়েকটা জায়গায়। পেয়ারা, আতা, পেঁপে, জাম, কেঁদফল, কুল খুব খেয়েছি সে সময়ে। সব ফলই পলাশ পাতার ঠোঙায় বিক্রি হত। ওখানে পলাশ গাছ তখন অনেক। পলাশ গাছে লাক্ষার চাষও হত। একেবারে হলুদরঙা পলাশ এক সময়ে দেখেছি শান্তিনিকেতনে, পরে দেখেছি ওখানে। এখন গেলে হয়তো দেখব গাছই নেই। সে জন্যেই আর যাই না ঘন ঘন, মাঝে মাঝে তবু যেতে হয়।

ছাউ স্টেশনে অনেক রাতে সব নিঃশব্দ হয়ে গেল। বৃষ্টির তেজ কমেছে, তবু একটানা পড়ছে। আমার সঙ্গী সাথী সবাই দেহাতী লোকজন। দিব্যি ঘুমোচ্ছে।

বাইরে ধরমনাথের নাক ডাকছে। এই সময়ে শুনেছিলাম কে যেন গুমরে গুমরে কাঁদছে আর বলছে আমি মরে যাই না কেন?

আমি উঠে গিয়েছিলাম। টিশনবাবু দেয়ালে হেলান দিয়ে কাঁদছে, মাথা এপাশ ওপাশ করছে। ওর মুখের ওপর প্ল্যাটফর্মের একমাত্র আলো। আলো ঘিরে খুব বাদুলে পোকা, এখনো মনে আছে।

আমি ওর কাছে গিয়েছিলাম।

—"কাঁদছ কেন" বলতেই ও চমকে উঠেছিল। তারপর বলেছিল, কত পাপ করেছিলাম বলতে পার?

—কি পাপ করলে?

—এই যে ঝড় উঠল। গাছ পড়ল। কালই ঠিক জানা যাবে আবার একটা মেয়ে উধাও হয়ে গেছে। সব আমার পাপে। আমার পাপে, কাকে বুঝাব? কে বুঝবে?

সেদিনই ওর কাছে ইর্-মিকিরের কথা শুনি। শোনার আগে অবশ্য ওর সঙ্গে ভাব হয়ে গিয়েছিল। পথেঘাটে বন্ধু পেয়ে যাই, ভাই পেয়ে যাই, ছেলে পেয়ে যাই, আমার জীবনটাই এ রকম। হয়তো আর দেখা হয় না। কিন্তু পথে পথে এমন অনেক ভালবাসা আজও পাই।

অনেক কথা বলে কি হবে। ইর্-মিকিরের কথাটাই বলি। সেদিন এই অবিশ্বাস্য কাহিনীকেও খুব বিশ্বাস্য মনে হয়েছিল। অন্তত টিশন বাবুর কাছে ব্যাপারটা যে সত্যি, সেটুকু বুঝতে পেরেছিলাম।

আমার বয়স কত বলো তো মাতাজী? তিরিশ বছরও হয় নি। কিন্তু এক রাতে সব চুল সাদা হয়ে গিয়েছিল। ভাবতে পারো?

—কি হয়েছিল?

—সেটাই তো কথা।

খুব পরিষ্কার হিন্দী। কোনো দেহাতি মিষ্টি টান নেই। কথায় মাঝে মাঝে ইংরিজি দুটো একটা শব্দও বলছিল।

মোহনলাল প্রসাদ কলেজেও তিন বছর পড়েছিল। কিন্তু বাবা মা মরে যেতে দাদারা ওকে পথ দেখতে বলে। সে সময়ে ও আর কোনো কাজ না পেয়ে একটা কবিরাজী ওষুধ কোম্পানীর হয়ে ওষুধ হয় যা থেকে, এমন গাছগাছড়া, মূল, পাতা জোগাড় করে বেড়াত। কাজ দাঁড়াল জঙ্গলে ঘোরা, গ্রামে থাকা।

—পথে ঘুরি। ধুতি আর পাঞ্জাবি পরতাম গেরুয়া রঙের। গ্রামের মানুষ সাধু সন্নেসী ভাবত। ফলে খাবার জুটে যেত, থাকার জায়গাও। অল্পসল্প টোটকা চিকিৎসা করতাম, খাতিরও পেতাম। সবই ঠিকঠাক চলছিল, হয়তো চলত, যদি না যেতাম সেই জায়গায়। যেখানে মাত্র এক বর্গ মাইলের মধ্যে একই জঙ্গলে ধাই, গঁয়দারি, ভেদক, কায়ফল, আমলা, কুড়, মালকাংলী, চিত্রক, নাগদোনী, খোকালী, মষবন, এ রকম ওষধিতে সব সবুজ হয়ে আছে। আর দেখলাম মরুপিপ্পল, কাশির ওষুধের জন্যে যার ছাল আর মূল খুব ভালো। ভেবেছিলাম রাজার ঐশ্বর্য পেয়ে গেছি।

বন দিয়ে চলতে চলতে ও দেখেছিল একটা জায়গায় শুধু ঘাস আর ঘাস। সবুজ, তেজালো ঘাস দেখে ও কৌতুহলে নেমে যায় ঘাস বনে। তারপর দেখে খুব সরু একটা ঝোরা বয়ে যাচ্ছে। জল পেয়ে ঘাস অমন সবুজ। ঝোরা পেরোতে একটা প্রাচীন অর্জুন গাছের নিচে একটা চ্যাটালো পাথর। পাথরটায় ও বসেছিল। বসেছিল বলেই দেখতে পেয়েছিল পাথরের গায়ে যেন কয়েকটা হিজিবিজি খোদাই করা। দেখে সেদিন ও কিছুই বোঝেনি।

খুব শান্তি লাগছিল। ঘুম পাচ্ছিল। বনে কোনো ভয় ছিল না। কেন যেন মনে হচ্ছিল চারিদিকে নিচু পাহাড়ের ঢালে এ বনে মানুষের হাত পড়েনি। গাছপালা সব যেন নিষ্পাপ, মানুষের লোভ তাদের ছোঁয় নি। কেউ যেন বনকে রক্ষা করছে। বয়স কম ছিল, মনও অন্যরকম ছিল। তখন কি জানি আমার পাপে সব······

মোহনলাল বন পেরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে কুরখিয়া গ্রামে পোঁছেছিল। গ্রামের মুখিয়া ওকে নিজের বাড়িতে নিয়ে যায়। মোষের দুধের দই, আচার আর ভুট্টার ছাতু খাওয়ায়। মোহনলাল খুব উত্তেজিত। ও জিগ্যেস করেছিল, বনটা কার?

—ও বন দেওদেওতার, সাধুজী। ও বনে কেউ গাছ কাটে না, পাতা নেয় না।

—কেন?

—চিরকালের নিয়ম। ফরেস বাবুরাও জানে। ওখানে মেয়েরা যায় ঘাস আনে। বাস, আর কিছুতে হাত দেয় না। অর্জুন গাছের নিচে দেবতার থান আছে। আমরা পূজা দিই।

—পাথরে কি সব আঁকা আছে?

—তবে তো আপনি দেখেছেন। রাঁচি থেকে বাবুরা এসে ফটো উঠাল, কত পড়তে চেষ্টা করল, পারল না।

—ফরেস বাবুরা গাছ কাটে না?

—না বাবু।

মুখিয়া সগর্বে বলল, ফরেসের ম্যাপে ও বনের নিশানা নেই। আর আশপাশে কোনো জঙ্গল ঠিকাদারও বনে হাত দেয় না। ভালা সিং মানল না, শাল গাছে কোপ লাগিয়েছিল। সে বাড়ি গিয়েই মরে যায়। আর সকালেই দেখা গেল যেমন গাছ তেমন দাঁড়িয়ে আছে।

—বনে যে অনেক ওষুধের গাছ!

—তুলতে যাবেন না বাবু। ওটা দেও-দেওতার বন।

মোহনলাল ভেবেছিল, দেহাতি লোকের কুসংস্কার। কিন্তু গ্রামের সবচেয়ে ধনী লোক নন্দলাল সাহুও বলেছিল, গরু, মোষ ও বনে ঢোকে না। শুধু মেয়েদের ওপর আশীর্বাদ আছে, তারা ঘাস আনতে যায়। আমি জঙ্গলের ঠিকাদার। দেওবনে কখনো ঢুকি নি।

—বনে জানোয়ার নেই?

—দুটো ভালুক, একটা গুলবাঘা, খরগোশ, হরিণ, সজারু আছে। পাখি আছে। সাপও আছে। কিন্তু মানুষের কোনো ক্ষতি তারা করে না। বন থেকে বাইরেও আসে না।

—দেওদেওতা কি আছে, নন্দলাল জী?

—শুনেছি, আছে। বনে শিকার করতে গিয়ে ডিহিরির লাটুবাবু তো পাগল হয়ে গিয়েছিল। অর্জুন গাছ ঘিরে চক্কর মারছিল। এ আমার স্বচক্ষে দেখা।

—তখন মোহনলালের জেদ চেপে যায়। যেমন করে হোক, ও গাছের নমুনা নিয়ে যাবে। মরুপিপ্পল গাছ তো খুব বিরল, খুব দুষ্প্রাপ্য। অমন কামলা লতা বা কোথায় দেখা যায়। বনটা ইজারা নিলে গাছ, শিকড়, ছাল, পাতা, মূল সরবরাহ করেই ও ধনী হয়ে যাবে।

মুখিয়া বোধহয় ওর মনের কথা বুঝেছিল। ও বলেছিল, লোভ করো না সাধুজী। আগে তো পাহাড়-বন-নদী সৃষ্টি হয়। মানুষ এল কত পরে। মানুষের লোভে সব নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। হয়তো দেওবন একমাত্র বন, যেখানে দেবতারা ঘুরে।

—আমার মনে লোভ ছিল বলেই আমি জানতাম না। বাপোতি জমি, কয়েকটা গরু, বাড়ির অংশ, কিছুতে লোভ করিনি। কিন্তু অত অত গাছপালা দেখে মনে যে কি দুরন্ত লোভ জাগল, তা কি বলি। ভাবতে থাকলাম কি কৌশলে বনটার বিষয়ে খবর বের করি। কেমন করে ওটা হাতে আনি।

—এসব ওষুধ বাকলের কি এতই দাম হয়?

লোকটি তাচ্ছিল্যভাবে ঈষৎ হেসেছিল।

—আমি যে বন দেখেছিলাম, সে বনের খোঁজ পেলে বড় বড় ভেষজ ওষুধ কোম্পানি লাখ লাখ টাকাকে টাকা মানত না। মুখিয়া বলেছিল, পৃথিবী তৈরি করার সময়ে সৃষ্টিকর্তা বুঝেছিলেন যে মানুষ, প্রাণী, সকলেরই গাছ চাই। সে জন্যে এ রকম দেওবন দিকে দিকে তৈরি করেন।

—দেওবন নামে তো আরো জায়গা আছে।

—না না, ওটাই সত্যিকারের দেওবন। ওখানে আকাশ নীল বুলবুলি দেখেছি, রুপোলি প্রজাপতি, আর সবুজ কাঠঠোকরা। দেখেছি ঘিয়াচেতবের ফুল, ও ফুলের গন্ধ শুঁকলে হাঁপানি সেরে যায়।

আমার মনে হয়েছিল অরণ্যবন কাট্টা পড়েছে বলে লোকটা দুঃখে পাগলাটে হয়ে গেছে, আর মনে মনে যে আদর্শ বনের ছবি আছে, তাই ও দেখছে মনের চোখে। ওর কাছে সে বন খুব সত্যি। মনে মনে যে সব কথা সত্যি হয়ে থাকে, তা চোখে দেখা যায় না বলেই কি মিথ্যে? আমারও তো মনে হয় যে ফল্গু যে কোনো দিন ব্যাগ নিয়ে হন্তদন্ত হয়ে হাজির হবে, আর "এঃ" বলে আমার সব বইপত্তর ঝেড়ে দেবে, বাজার করে আনবে জ্যান্ত ছোট মাছ আর ধনে পাতা।

কোনটা মিথ্যে হয়েও সত্যি, আর কোনটা সত্যি হয়েও মিথ্যে, তাই খুঁজতে খুঁজতে তেষট্টি বছরের বুড়ি হয়ে গেলাম।

সেই বনে ও বারবার যেত। বলত, কিছু করব না, দেখে বড় শান্তি পাই, আর মুখিয়া মাথা নাড়ত।

তারপর এক বর্ষার দুপুরে, আকাশ যখন মেঘে ঘোলাটে, আর বৃষ্টি আসতে অনেক দেরি, মোহনলাল গিয়েছিল অর্জুন গাছের নিচে সেই চ্যাটালো পাথরটার কাছে। দাঁড়িয়ে দেখছিল হিজিবিজি সেই আঁচড়গুলোর কোনো অর্থ আবিষ্কার করা যায় কি না।

ঘাস বনে সাতটি মেয়ে ঘাস তুলছিল, বোঝা বাঁধছিল। মুখিয়ার মেয়ে সোমনি বলল, বাবু কি দেখিস?

—পাথরটা।

—দেখে কি বা বুঝবি?

সেই সময় টপ টপ করে কয়েক ফোঁটা বৃষ্টি পড়ল। মেয়েরা ঘাস তুলে বোঝা বাঁধছে। মোহনলাল চেয়ে আছে পাথরটার দিকে, ওর হঠাৎ মনে হল আঁকিবুকিগুলোতে ওকে আঙুল বোলাতেই হবে। ঝুঁকে পড়ে আঙুল বোলাতেই ওর মাথায় যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল।

—আমি বুঝতে পারলাম কি লেখা আছে,

আমি বুঝতে পারলাম চেঁচিয়ে শব্দগুলো উচ্চারণ করলে ভয়ানক কিছু ঘটবে, কিন্তু আমার তখন কোনো শক্তি নেই। আমি যেন কোন একটা শক্তির কাছে অসহায় তখন। অর্জুন গাছের নিচে তখন অন্ধকার, আকাশ খুব কালো। মন বলল, পালাও মোহনলাল! মুখিয়ার বাড়িতে ঘোরে না কি আমি কি একটা দুর্বোধ্য শব্দ বলে চেঁচিয়েছিলাম।

"হ্যাঁ, জাজগড়াতেও হঠাৎ আকাশ কালো করে মেঘ নেমেছিল। সবাই বলছে মেঘ তো নেমে এল, মাঠ থেকে সবাই দৌড়ে ঘরে ফিরছিল, শুধু ফিরল না রামপতিয়া।

জানতে চেয়েছিলাম কবে।

সে নাকি সাত আট দিন আগে। মেথরটি বলল, এ কি আশ্চর্য ঘটনা। পুলিশ খুঁজছে, মানুষ খুঁজছে, মেয়েটার চিহ্ন কোথাও নেই। মেঘও মাটিতে নেমে আসে, এমন কথা কে কোথায় শুনেছে?

রাঁচির হিন্দী কাগজে খবরটা বেরোয়। খবরটা পড়ে কয়েকজন সাংবাদিক জাজগড়াতে এসেছিল, দেওবনেও যায়।

উত্তরটা জানতাম আমি, বলতাম কি করে?

আমি বললাম, সেই থেকে তুমি ছাউতে বসে আছ?

ও আবার দুর্বোধ্য হাসল। হাসলে কাউকে এমন শ্মশানপোড়া ভয়ংকর দেখায় তা আমি আগে দেখিনি।

—মলহারপুরে নাম ভাঁড়িয়ে চায়ের দোকানে কাজ করেছি। শুধু আকাশে মেঘ দেখলে ভয় পেতাম। ঘরে গিয়ে মুখ ঢেকে শুয়ে থাকতাম। কিন্তু আমি তো আমার বশে থাকতাম না। কে যেন ভীষণ আক্রোশে আমাকে অবশ করে আমাকে দিয়ে বলিয়ে নিত সেই সর্বনাশা শব্দ দুটো। আর পরদিন ঠিক খবর পেতাম, সর্বনাশ হয়ে গেছে। হাট ফিরতি মেয়েরা চারজন গাছের নিচে বসেছিল। হঠাৎ মেঘ নেমে এসে তাদের ঢেকে ফেলে। যখন সব পরিষ্কার হয়ে যায় সব চেয়ে ছোট মেয়েটাই নেই।

এ রকম আরো একবার হয়েছে। তবে ছাউ পৌঁছতে মোতিয়ার মা বুড়ী আমাকে খুব সুনজরে দেখে। বলে, কিসের অশান্তিতে জ্বলে আছ তুমি, দেওতার পূজা করো, শান্তি পাবে। মোতিয়ার মার মহিষ চরিয়েছি, ওর গোয়ালে কাজ করেছি। টিশনে যাত্রীদের সেবা করি। যদি এ সব কাজে আমার শাপ কেটে যায়। আমি ভুলে যাই।

কিন্তু বারিষ নামলেই আমি ভয় খেয়ে যাই। আজ তো আমি কিছু বলিনি, তবু গাছ পড়ল। বারিষ যদি চলতে থাকে। আমার বশ চলে যায়, আমি বেখেয়াল হয়ে যাই।

আমি আস্তে বললাম, তুমি চুপ করেই ছিলে। কিন্তু কি ভীষণ ঝড়ে গাছ পড়ল। হয়তো আগেও······

—কিন্তু একটা করে মেয়ে তো নিমেষে উধাও হয়েছে।

—সত্যিই তাদের পাওয়া যায় নি?

—না, কাউকে না।

—এর কোনো ব্যাখ্যা নেই?

—তাই তো খুঁজছি।

—এর উপায়ও নেই?

ও এবার খুব সুন্দর হেসেছিল। বলেছিল, আছে বই কি। উপায় আছে আমার সাহস নেই।

—তুমি কোনো শহরে চলে যাও না?

—ভয় করে। আমাকে আমি ভয় পাই যে।

ও বলেছিল, কত নরম মন ছিল আমার। বাজারে পাঁঠা কাটা দেখতে পারতাম না·····দাদা আমাদের রাখালকে মেরেছিল বলে দাদার সঙ্গে কথা বলি নি কতদিন····· আর সেই আমি কতজনের কত সবনাশ করলাম, এখন জানি, ও গাছপালা নয়, ওই পাথরটা আমাকে টানছিল।

—এ তুমি ভাবছ।

—টানছিল। ওরও ইচ্ছা করছিল শক্তি দেখাতে, অরণ্য বন কাটে যে মানুষ, তাকে শাস্তি

দিতে। এ সব কথা আমার মনে হয়, আমার মনের মধ্যে কে যেন বলে দেয়। আমাকে কেন বেছে নিল তাই ভাবি। ওই দেওবন থেকে শুরু।

—দেওবনে যাওয়া যায়?

ও মাথা নেড়েছিল।

—কেউ ঢুকত না। আগুন জ্বালত না। কিন্তু আমি চলে আসার পরের বছরই চৈত্র মাস নাগাদ ঝোরা শুকিয়ে যায়। গাছ মরে যায়। একদিন খুব কম ঝড় বাদলেই বাজ পড়ে অর্জুন গাছটা আগে জ্বলে ওঠে, সে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। তিনদিন ধরে জঙ্গল জ্বলেছিল বলে শুনেছি। আমি জানি, আমি মরে গেলে তবে ওই পোড়া মাঠে আবার ঘাস হবে, গাছ হবে, ঝোরা থেকে জল নামবে।

—বনটাই জ্বলে গেল?

—একেবারে। আর তো দেখতেও পাবে না কেউ, সত্যিকারের জঙ্গল কি জিনিস! মানুষ সে জঙ্গল তৈরি করতে পারে না, শুধু বিনাশ করতে পারে।

তারপর বলল, বারিষের মৌসুমকে আমার ভয় করে। আমি তো আর কোনো পাপ করতে চাই না। চলে যান মাতাজী, রাত তো শেষ হয়ে এল। থোড়া বহুত আরাম করে নিন।

—তুমি কোথায় যাচ্ছ?

—মোতিয়ার মার ঘরে। এখন গাই-বলদ-মোষকে গোয়াল থেকে বের করব, ও দুধ দোহাবে, আমি গাই চরাব না আজ। টিশনে থোড়া বহোত কাজও থাকবে। আপনাদের বাস মিলবে ন'টায়। একটু ঘুমাতে পারবেন।

সত্যিই ঘুমিয়েছিলাম। ধরমনাথ না ডাকলে ঘুম ভাঙত না। কোনো রকমে মুখে চোখে জল দিয়ে "উর্বশী" বিস্কুট আর চা খেতে খেতে ভয়ংকর গণ্ডগোল তুলে "মহাবীর" বাস এসেছিল আর "শোলে" ছাপ গেঞ্জি পরা হেলপার চেঁচিয়ে বলেছিল, "বিফোর টাইম, আইয়ে সটাসট।"

যাবার সময়ে কোথাও দেখি নি টিশনবাবুকে। ধরমনাথ বলেছিল, সাধুসন্ত মানুষ। যাত্রীদের সেবা করবে, টিশনের কামরা সাফা রাখবে। ছোট টিশন, জমাদার নেই। মনে হয় কোনো আমীর আদমি, স্বেচ্ছায় ঘর ছেড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

পাগলাটে, এই যা!

টিশনবাবুই বলো, বা মোহনলাল, তাকে আমি আর দেখি নি। ধরমনাথ বলেছিল, পয়সা কখনো ছোঁয় না।

—সত্যিই তাই?

—হ্যাঁ হ্যাঁ। মোতিয়ার মা খাওয়ায়, নয়তো ধাবায় খায়। কুর্তা ধুতি চাদরও মিলে যায়। জুতা চটিও পরে না, চুলও আঁচড়ায় না, মাঝে মাঝে চুল কাটে।

—অনেক দিন দেখছ?

—কয়েক বছর। আমার গ্রামে কতবার নিয়ে যেতে চেয়েছি, কিছুতে যাবে না। যেন ডর খেয়ে যায় চেঁচাতে থাকে।

বাসের আরেকটি যাত্রীও বলল, বারিষের মৌসুমে ওর পাগলাপনা বাড়ে। ভগবানের কত রকম খেলা।

আমার দু'পাশ দিয়ে সরে যাচ্ছিল নিচু পাহাড়, কিছু গাছ, ছোট ছোট গ্রাম।

ধরমনাথ বলল, সব বনজঙ্গলে ঢাকা ছিল।

হেল্পার বলল, কবে?

—তোর জন্মের আগে।

—ও, পুরাণা জমানায়?

—চুপ কর্।

ধরমনাথ আবারও চোখ বুজল। আজ ওর গ্রামে থাকব, কাল খোলা হবে "হোমিও দাতব্য চিকিৎসালয়"। পরশু ওর মেয়ে যাবে নার্সের ট্রেনিং নিতে। তিন দিনের প্রোগ্রাম।

কলকাতায় ফিরেই আবার দৌড়েছিলাম মুর্শিদাবাদ। ফিরে এসে তবে ধরমনাথের চিঠিটা পাই।

"মহাবীরজীর কৃপায় ওরা সবাই ভালো

আছে। আমিও যেন ভালো থাকি, একশো বছর বাঁচি। ধরমনাথের বাছুরটা কি অসুখে মরে গেছে। গ্রামে দরকার পশুবৈদ্য। তবে বৃষ্টি ভালো হয়েছে, কুয়োতালাও ভরে উঠছে। খুবই তাজ্জুবের বাত, যে আমরা চলে আসার পরই কয়েকদিন বাদে টিশনবাবু মারা গেছে। খুব তাজ্জুব ঝড়ও হয়েছিল। ধাবায় বসে চা খেতে খেতে হঠাৎ যেন টিশনবাবু কি বলতে শুরু করে। তারপর নিজের গলা নিজে টিপে ধরে বেঞ্চি উলটে, মানুষজন ঠেলে দৌড়াতে থাকে মাঠের দিকে। দৌড়াতে দৌড়াতে ও প্রায় মিলিয়ে যায় মাঠের ওপারে। তখন ও কিছু একটা বলছিল, ভীষণ চেঁচাচ্ছিল। ধাবার দুটো ছেলে দৌড়ে যায় ওকে ধরবে বলে। কিন্তু তখন নাকি ভীষণ কালো মেঘে সব আঁধার হয়ে যায়। ওরা দাঁড়িয়ে পড়ে। মেঘ কাটলে পরে ওরা আবার দৌড়োয়। টিশনবাবুকে যেখানে দেখেছিল, সেখান থেকে অনেক দূরে সে মরে পড়ে আছে। অসপাতালের ডাক্তার বলেছে খুব উপর থেকে ও পড়ে গেছে। তাতেই মরে গেছে। ধাবার ছেলেদের কোনো জুলুম করে নি থানা, কেন না সব কিছু ঘটেছে অনেক বাসযাত্রী আর হাটুরিয়া লোকদের সামনে। সব হাড়গোড় চুরচুর হয়ে গিয়েছিল।"

চিঠিটায় ধরমবীরের সই, লেখাটা ওর মেয়ে মাধবীর।

চিঠিটা হাতে নিয়ে আমি চুপ করে বসে ছিলাম। ভিতর থেকে কোনো শক্তি ওকে দিয়ে ইর্-মিকির বলাতে চেষ্টা করছিল?

ও বলতে চাইছিল না?

সেই শক্তিটাকে অন্যের ক্ষতি করতে দেবে না বলে ও ছুটে গিয়েছিল? ও জানত যে ও শেষ হয়ে গেলে সে শক্তিটাও পরাস্ত হবে?

জানি না আমি টিশনবাবু ওরফে মোহনলাল প্রসাদের মৃত্যুর বৈজ্ঞানিক, বাস্তব ব্যাখাও করা যায় নিশ্চয়।

ঝড় বাদলে আছড়ে পড়ে অমন রোগা, দুর্বল মানুষ মারা যেতেও পারে।

কিন্তু তাতে তো উঁচু থেকে আছড়ে ফেলার মতো করে হাড়গোড় চুর চুর হবে না।

আর, ধাবার উলটো দিকে সমতল মাঠ। পাহাড় তার থেকে অনেক দূরে।

কি হয়েছিল তা পাহাড়গুলো জানতে পারে।

আমি জানতে পারব না। পাহাড়-বন-নদী আজকের মানুষকে বিশ্বাস করে না, কথাও কয় না।

টিশনবাবু আমার কাছে ব্যাখ্যাতীত হয়েই রইল।

ময়ূর

বিশ্বপ্রিয়

কাজল কালো বাদল মেঘে
আকাশ ছেয়ে এলে,
কোন সে পাখি রঙ্ বাহারি
পেখমটি দেয় মেলে?
যার পেখমে চিকন বুটি,
মাথায় আবার ঝুম্‌কো ঝুঁটি,
পাখির রাজা সেইতো ময়ূর;
আপন মনের সুখে
তা ধিনা ধিন্-নাচে কেমন
কদমতলীর বুকে!!

টোটোর অ্যাডভেঞ্চার
গল্প- নন্দিনী দাশ, ছবি-প্রশান্ত

একটু পরে
কি মনে হচ্ছে ডাঃ মিশ্র?
বেঁচে যাবে মনে হয়
উঃ এসে থেকে একটু বিশ্রাম পেলাম না
একটু শোয়া যাক
কে রে?!
হুঁ হুঁ সবেস্তুর এইবার ঠেলা বুঝবে
শিম্পুটা আবার কোথায় গেল দেখে আসি
গর-র-র বাঁচাও গেলাম
সিং!!
দুম
উঃ ভাগ্যিস ঘুমপাড়ানী গুলি ছিল
কিন্তু আমরা আসার পর থেকেই এত দুর্ঘটনা হচ্ছে সত্যিই কি অভিশাপ লাগল?
চলবে

ভূত ছাড়ানোর গল্প

অশোক মুখোপাধ্যায়

দিদা বললেন, শোন তোরা সব, আজকে তোদের বলব
হিন্দা ওঝার তাক-লাগানো ভূত ছাড়ানোর গল্প।
চৌরিচোরায় তোদের দাদু তখন রেলের ডাক্তার,
চিনত সবাই—এমনি ছিল শহরে নাম ডাক তাঁর।
হাসপাতালের কাছেই বাসা ; মাঠ পেরিয়ে রাস্তা,
মাঠের ধারে বাস করত হৃদয় ভূষণ হাঁসদা।
চৌরিচোরায় বিখ্যাত সে—সংক্ষেপে নাম হিন্দা,
জানত মারণ বশীকরণ ভূত ছাড়ানোর বিদ্যা –
বিদঘুটে ভূত হোক না যেমন—মামদো, পেঁচো পান্তো
মন্ত্র বলে পেটের কথা হিঁচড়ে টেনে আনত।

ব্রহ্মভূতের ভর যদি হয়, সংস্কৃত শুদ্ধ,
গোভূত হলে মুণ্ডু নেড়ে হাম্বাধ্বনি ক্রুদ্ধ,
পেঁচোয় পাওয়া রুগীর ভাষা বুঝতে পারা কষ্ট,
শ্যাওড়া গাছের শাঁকচুন্নির চন্দ্রবিন্দু স্পষ্ট।
রুগীর যখন চোখ ঘুলিয়ে দাঁত দিয়ে দাঁত ঘর্ষণ
হিন্দা ভূতের মুখ খুলিয়ে করত গালি বর্ষণ ;

গালির পরে প্রহার খালি, সঙ্গে পোড়া সর্ষে,
ভূত যদি না ভাগত তাতে, প্রহার আরো জোরসে ;
হোক না সে ভূত উৎকলীয়, মাদ্রাজি কি কাচ্ছি
মারের চোটে বলত শেষে, যাচ্ছিরে ভাই যাচ্ছি।
ছগন লালের পুত্র মগন, দিব্যি তাজা স্বাস্থ্য
সাইকেলে সে হেসে খেলে দুধ যোগাতে আসত ;
সেদিন নেমে বেল তলাতে যেই বলেছে, দূর ছাই,
অমনি ভূতের ভর হল তার, হাত পা ছুঁড়ে মূর্ছাই।
তোদের দাদু এসে দেখেন, ভীড় জমেছে মস্ত
হাজির স্বয়ং হিন্দা ওঝা, ভূত ছাড়াতে ব্যস্ত —
বাঁশবাখারি হাতে শুধোয়, 'বল্ কে রে তুই সত্যি।'
জবাব এল হেঁড়ে গলায়, 'অহং ব্রহ্মদৈত্যি।'
'মগার ঘাড়ে কী কারণে? কোন দোষে সে দুষ্ট?'
'মগনস্য আচরণে অহং অসন্তুষ্ট,
ভ্রষ্টাচারী মূঢ়মতি অনুস্বারে অং বং
বিল্বতলে দুগ্ধে জলং অতীব পাপ কর্মং।'
'প্রাশ্চিত্তির করবে মগা' বললে হেঁকে হাঁসদা,
'এখন তুমি মানে মানে দেখ আপন রাস্তা।'
ওঝার দাপট বাড়ছে ক্রমে, সঙ্গে নাচন ধেই ধেই
সন্দেহ নেই মগার ঘাড়ের ভূত এবারে নামবেই।
কিন্তু উঁহু, খুঁতখুঁতে ভূত বিগড়ে গেছে ভাই হে,
দেবভাষা নয় বাংলা ভাষার উল্টো কী সব গাইছে
বলছে, 'শোনো হৃদয় ভূষণ, ইহাতে নাই সংশয়
জল দিয়ে দুধ বেচাই নিয়ম বনেদী গোপ বংশয়,
কিন্তু তুমি ধেড়ে বাঁদর, এবার যাবে জেল কি,
হরবোলা ডাক ডেকে দেখাও ব্রহ্মভূতের ভেলকি।'
চেনা গলায় ধমক শুনে হৃদয় গেল চুপসে
তাকায় শুধু ফ্যালফেলিয়ে, এক্কেবারে চুপ সে।
এমন সময় গাছের আড়ে ও কার মুখচন্দ্র ?
সামনে এসে মুচকি হাসেন রেল-ডাক্তার চন্দ্র।

হৃদয় যেন ভূত দেখেছে. চমকিয়ে হৃৎকম্প
'যাচ্ছি,' বলে দুহাত তুলে প্রকাণ্ড এক লম্ফ—
রইল পড়ে মারণ-তাড়ন, ছুটল সিধে হিন্দা
চৌরিচোরায় দেখায়নি আর ভূত ছাড়ানোর বিদ্যা।

মজার চিঠি

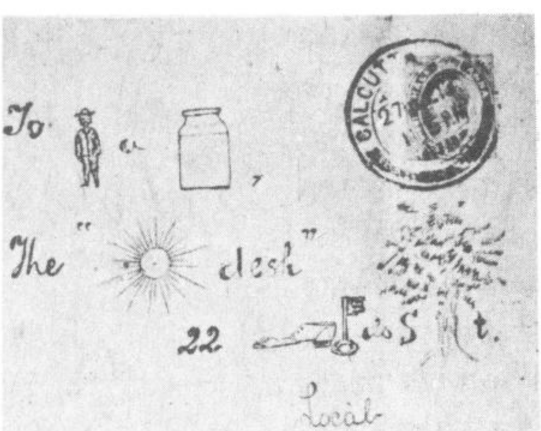

সেদিন ডাকওয়ালা আমাদের কার্যালয়ে একটি মজার চিঠি দিয়ে গিয়েছে। চিঠি খানির ছবি দেওয়া হল। শ্রীযুক্ত আশুতোষ মিত্র চিঠিতে লিখেছেন—'কিছুদিন পূর্বে একখানি ইংরেজি কাগজে ছবি এঁকে ঠিকানা লেখা খামের ছবি দেখেছিলাম। সেখানি লণ্ডনের একটি ডাকঘরে পোস্ট করা হয় এবং ঠিক সময় নির্দিস্ট স্থানে পৌঁছয়। আমাদের দেশের পোস্ট অফিস ওরূপ চিঠি ঠিক বিলি করবার জন্য যত্ন নেয় কিনা দেখিবার জন্য এটি জেনেরাল পোস্ট অফিসে পোস্ট করলাম।'

আষাঢ় ১৩২০

চাষীর মেয়ে সোনা। চাষীর ঘর আলো করে উঠোনে হামাগুড়ি দেয়। একটু-খানি জায়গা মায়ে বাপে বেড়া দিয়ে দিয়েছে, যাতে বাইরে বেরিয়ে না যায়। নরম লতা দিয়ে ঢেকে দিয়েছে, পাছে মেয়ের হাতে পায়ে লাগে।

সোনা একটু বড় হয়েছে। মা ভাবে, সোনার হাতে দুখানি কাঁকন দিলে বড্ড মানাত। তা কোথায় পাবে বলো? সোনার যা দাম। তাছাড়া চুরির ভয় আছে না?

একদিন সোনাকে নিয়ে নদীতে নাইতে গেছে বাপমায়ে। নাইয়ে ধুইয়ে গা মুছিয়ে দিতে যাবে, কি, দেখে, মেয়ের গায় বালি চিকচিক করে। কত মুছলে, কত ঝাড়লে, সে বালি আর কিছুতেই ঝরে না। তখন ভাল করে নিরীক্ষণ করে চাষী বললে, অ বৌ, এতো বালি নয়, এ যে দেখছি সোনা! তুই মেয়ের হাতে কাঁকন দিতে চাইছিলি। তা নদীমা তোর মেয়ের সারা গায় গয়না পরিয়ে দিয়েছেন।

অ্যাঁ, তাই নাকি? বলে মেয়েকে আঁচল দিয়ে ঢেকেচুকে চাষীবৌ বাড়ি নিয়ে এল।

আছে। সোনা উঠোনে খেলা করে। গায়ের সোনায় রোদলেগে ঠিকরোয়। গাঁ-শুদ্ধ সবাই দেখে আর আশ্চয্যি মানে। মা ঘরের পাট সারতে সারতে চোদ্দবার এসে দেখে যায়।

একদিন। বাবা গেছে ক্ষেতে, মা রান্নাঘরে দুধ জ্বাল দিচ্চে, দুধ উথলোব-উথলোব করচে। সোনা উঠোনে একা। এক চোর—এতদিন ধরে তক্কে তক্কে ছিল—এসে সোনাকে তুলে নিয়ে চম্পট। মা দুধ খাবার জন্যে ডাকতে এসে দেখে, মেয়ে নেই। কখন কী হয় ভেবে চাষী এক ঘণ্টা বেঁধে দিয়েছিল ঘরের মধ্যে। সেইটি ধরে মা পাগলের মত বাজাতে লাগল—ঢংঢংঢংঢং ঢংঢংঢংঢংঢং—সারা গাঁ ছুটে এল। তারপর হাতের কাছে যে যা পেল নিয়ে ছুটল চোর ধরতে।

চোর ওদিকে সোনাকে নিয়ে হনহনিয়ে যাচ্ছে। বড় রাস্তায় পড়েই দেখে কি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দু-তিনটে গাড়ি আসছে। হঠাৎ সামনের গাড়ি থেকে একজন চেঁচিয়ে বললে, আরে ঐ তো। সব কটা গাড়ি একসঙ্গে ঘ্যাঁচ করে থেমে গেল। দু-তিনজন একসঙ্গে লাফিয়ে পড়ে চোরকে ধরে ফেললে। চোর বললে, এ তো

আমার মেয়ে। বড্ড কান্নাকাটি করছিল, তাই বেড়াতে নিয়ে যাচ্ছিলুম। গাঁয়ের লোকেরা পেছন থেকে গর্জন করে বললে—মিথ্যেকথা। চাষীও ততক্ষণে ভিড় দেখে ক্ষেত থেকে ছুটে এসেছে। সোনা বাবার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। চাষী বললে, আপনারা ?

—আমরা সরকারের লোক। আপনার মেয়ের কথা শুনে যন্ত্রপাতি নিয়ে এসেছি নদীতে সোনা খুঁজতে।

—খুঁজুন।

লোকেরা গাড়ি করে সোনা আর সোনার বাবাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে যন্ত্রপাতি বসিয়ে নদীতে সোনা খুঁজতে লেগে গেল।

গাঁয়ের লোকেরা মারতে মারতে চোরকে ভাগাল।

সেই থেকে সেই গাঁয়ের নাম হল সোনার গাঁ।

সরকারের লোকেরা নদীর জলে সোনা পেল বটে, কিন্তু এত কম যে তোলা পোষাবে না।

পাততাড়ি গুটিয়ে তাঁবু উঠিয়ে যেদিন তারা চলে গেল, গাঁয়ের লোক হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। নদীমাও হাঁপ ছাড়লেন। খোঁড়াখুঁড়িতে এতদিনের ময়লা বেরিয়ে তলাটা পরিষ্কার হয়ে গেল কিনা। তাছাড়া বুঝতেই পারছ, বুকের ওপর দম-আটকানো নল বসানো, ইঞ্জিনের আওয়াজ—ও কি কারো ভাল লাগে ? বল ? মন খুলে স্রোতের

আঁচল দুলিয়ে কুল কুল করে বইতে লাগলেন আর দু-কূল ভরে ফসল্ল ফলাতে লাগলেন।

সোনা আরো বড় হয়েছে। পাঠশালের উঁচু ক্লাসে পড়ে। সংস্কৃতের দিদিমণি নাম রেখেছেন নদীমাতৃকা। নদীমাতৃকা বন্ধুদের নিয়ে নদীতে সাঁতার কাটে ওবেলা একঘণ্টা এবেলা একঘণ্টা। বন্ধুরা বলে, আমরাও তো সাঁতার জানি। কিন্তু তুই যেন জলের মাছ। নদী-মা হিরণ্যবক্ষা ঢেউ দুলিয়ে হাসেন। সোনার হাতে গলায় সোনা চিকচিক করে।

আর একটা অদ্ভুত ব্যাপার শোনো। নদীতে কেউ নোংরা করলে সোনা ঠিক টের পায় যেখানেই থাকুক। বাঘিনীর মত ছুটে আসে। একজনকে তো আধমরা করে ছেড়েছিল। আর একজন কারখানা বসিয়েছিল। হু হু করে নোংরা জল পড়ছিল নদীতে। সোনা সবাইকে নিয়ে ধর্না দিয়ে বন্ধ করিয়ে ছাড়ল। সেই থেকে সোনার-গাঁয়ের লোকেরা কেউ নদী নোংরা করে না। ভিনগাঁয়ের লোকেরা এসে বলে, বাঃ, তোমাদের এখানে নদী তো বেশ পরিষ্কার। আমাদের ওখানে এই নদীই যেন নর্দমা।

সোনা বলে, নদী যে মা, সত্যিকারের মা। শুধু কি জল? জল-কে-জল? দুধ-কে-দুধ। দেখ নি, ধানের বুকে টসটস করে? মায়ের দুধ খাও আর মায়ের গায়ে কাদা ছোঁড়, তোমরা কী? মানুষ না পিশাচ?

মিথ্যে কথায় সিদ্ধিলাভ

করুণাময় বসু

বদ্যিবাটির আদ্যিচরণ মিথ্যে কথায় সিদ্ধ ছিল,
আদ্যি নাকি পদ্য লেখায় বিশেষ কৃতবিদ্য ছিল।
রবি ঠাকুর হার মেনে যায়, ছন্দ এমন মিষ্ট ছিল,
কেউ পড়েনি সেই কবিতা, আদ্যি নিজে হৃষ্ট ছিল।

আদ্যি বলে যৌবনেতে বাঘ শিকারে দক্ষ ছিল,
স্বনাম ধন্য জিম করবেট, তাঁহার সমকক্ষ ছিল।
মাউন্ট এভারেস্ট্ শৃঙ্গ জয়ে সদাই তাহার লক্ষ্য ছিল,
স্যর হিলারি ও তেনজিঙের সঙ্গে খুবই সখ্য ছিল।

ফুটবলে সে পারদর্শী, এমনিতরো ভঙ্গী ছিল,
খেলার মাঠে গোষ্ঠ, কুমার, সামাদ তাহার সঙ্গী ছিল।
প্রশ্ন করি, তোমার সঙ্গে আর কে কে সব খেলেছিল?
বললে হেসে, বেকেন বাওয়ার, মারদোনা আর পেলে ছিল।

শিশিরকুমার মজুমদারের
ধারাবাহিক উপন্যাস

থার্টিন আপ ঝমঝমা এক্সপ্রেস

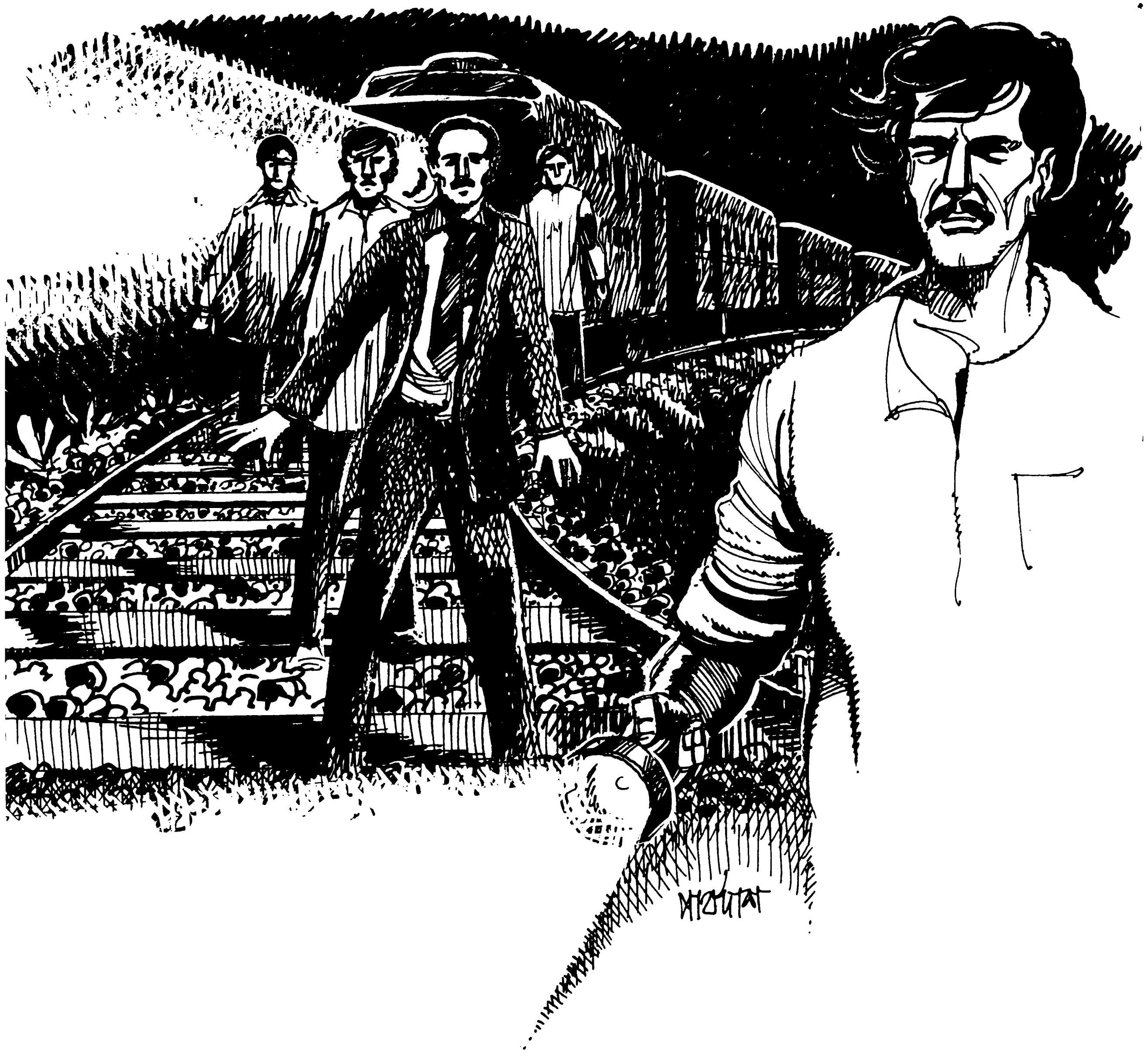

(দুপুর থেকে ঝড়জল সুরু হয়ে বিকেলে প্রচণ্ড রূপ নিল। চাকরিতে বদলি হয়ে অবনীবাবু স্ত্রী-ছেলে-মেয়েকে নিয়ে থার্টিন আপ ঝমঝমা এক্সপ্রেসে ধুমলগড় যাচ্ছেন। ছেলে সন্তু এবার মাধ্যমিক পাস করেছে, মেয়ে সুধা হায়ার সেকেণ্ডারি। মালপত্র নিয়ে সবাই যখন একটা প্রায়-খালি কামরায় উঠলেন, আকাশ ভেঙে বৃষ্টি পড়ছে। আলুথালু, নোংরা পাজামা-পাঞ্জাবী পরা উস্কো-খুস্কো চুল, সামনে বসা ছেলেটি যেন গভীর চিন্তায় মগ্ন। অবনী-বাবুরা বাঙালী জেনে সে জায়গা বদল করে দূরে গিয়ে একটা কোণে বসল। পাগল নাকি ? চোর ছ্যাঁচড় নয় ত ?

গাড়ি ছেড়ে দেবার পরে একজন লোক হুড়মুড়িয়ে উঠে পড়লেন—পরিচয় হতে নাম বললেন আসগর আলি। তাকে আধভেজা দেখে অবনীবাবু শুকনো জামা কাপড় দিলেন, বাথরুমে ঢুকে ছেড়ে নিলেন। সন্তু লক্ষ্য করল পাশ পকেটে কালো একটা ভারী জিনিস রাখলেন। কেমন লোক ? সঙ্গে মালপত্র কিছুই নেই। এরা দুজন একই দলের ডাকাত নয়তো ?

ওদের মা লুচি আলুর দম মিষ্টি বাটিতে বাটিতে ভাগ করে সকলকে দিলেন। আসগরকেও। তারপর সন্তুর হাতে ওদিকে বসা ছেলেটিকেও এক বাটি খাবার পাঠালেন। প্রথমে আপত্তি জানালেও তারপর সে গোগ্রাসে খেয়ে নিল। কি যেন এক রহস্য আছে। সন্তুর মনে হ'ল যে সে বসে কাঁদছিল। কোথা থেকে আসছে জিজ্ঞাসা করাতে চমকে উঠল।

সুরাইয়া নদীর ব্রিজ পার হয়ে ট্রেন চলল। এর পরে পাপান নদী পার হয়ে মাঝাণ্ডি, সেখানে বড় মিলিটারি বেস আছে। গাড়ি খুব লেট চলছে। সামনের জানলা একটু খুলে অবনীবাবু দেখলেন চারিদিকে জল আর জল—রেল লাইন ছুঁই ছুঁই! আতঙ্কভরা মুখে উনি বসে পড়লেন।)

॥ ২ ॥

আসগর আলি হেসে বললেন, দাদা, ভয় পাবেন না। গাড়ি ঠিকই কাল গিয়ে পৌঁছাবে ধুমলগড়। তবে বুঝতেই তো পারছেন বেশ লেট হবে।

মা বললেন, 'ভালয় ভালয় পৌঁছালে হয়। অতরাতে নতুন জায়গা, কোথায় যেতে কোথায় গিয়ে পড়ব, তুমি বাবা আমাদের একটু সাহায্য কোরো। তোমার তো ঝাড়া হাত পা।'

আসগর আলি থমকে গেলেন একথা শুনে। কি যেন বলতে গিয়ে বলতে পারলেননা কিছুক্ষণ, শেষে বললেন, 'মাসিমা, কালকের কথা আজ ভেবে কেন চিন্তা করছেন বলুন তো ?'

গাড়ির গতি আরও কমে গেল। একসময় তা প্রায় থেমেই এল। হঠাৎ ইনজিনের দিক থেকে বিশ্রী ভাবে হুইসিল বেজে উঠল, ঝাঁ-আঁ-আঁ করে সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড জোরে ব্রেক কষে গাড়িটা ঝাঁকানি দিয়ে থেমে গেল।

অবনীবাবু বেশ ভয় মেশান গলায় বললেন, 'কি হল ?'

ওদিক থেকে সেই বৃদ্ধ বললেন, 'সিগনাল শায়দ নেহি মিলা। আগেহি পাপান নদীকা পুল হ্যায়। উসকো বাদ মাঝাণ্ডি।'

অবনীবাবু আবার বললেন, 'এখন গাড়ি ভালয় ভালয় মাঝাণ্ডি পর্যন্ত পৌঁছালে হয়।'

ওর কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে ইনজিনের হুইসিল ভীষণ ভাবে বার বার বেজে উঠতে লাগল।

বাইরে যে কোথায় কি হচ্ছে কে জানে। গাড়িটা ঠায় দাঁড়িয়ে গেল। চলার আর কোনই লক্ষণ দেখা গেল না।

আধঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকার পর আসগর আলি বললেন, 'তাই তো, ব্যাপার ভাল মনে হচ্ছে না। এতো সিগন্যালের ব্যাপার নয়।'

তখনি অত ঝড় জলেও বাইরে মানুষের গলায় আওয়াজ শোনা গেল। কারা যেন

বেশ উত্তেজিত ভাবে কথা বলছে। তার মানে সামনে কোথাও কিছু হয়েছে নিশ্চয়ই। ওদিক দরজার সামনের একজন ছোকরা উঠে গেট খুলে ফেলল। হাঁ হাঁ করে আশপাশের অনেকেই চেঁচিয়ে উঠল; ছেলেটা শুনল না। বৃষ্টির মাঝে সামনে ঝুঁকে জিজ্ঞাসা করল 'কেয়া হুয়া ভাই, গাড়ি রুক গেয়া কিঁউ ?'

বাইরে থেকে কে যেন চেঁচিয়ে বলল, 'গাড়ি আগে আউর নেই যায়েগা।'

আসগর আলি লাফিয়ে উঠে দরজায় কাছে চলে গেলেন। ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কিঁউ কেয়া হুয়া ?'

'সামনে লাইন তোড়মোড় গিয়া। ব্রীজ ভি পানিকা নিচে।'

'তার মানে ?' বলে ঝপ করে নিচে নেমে পড়লেন আসগর আলি। বৃষ্টির ছাঁট তত বেশী নেই। ঝোড়ো হাওয়ার তাণ্ডব চলছে শুধু। তার মধ্যেই এ গাড়ি ও গাড়ি থেকে বহু লোক নেমে পড়েছে নিচে। ক'পা এগিয়ে সামনে গিয়েই থমকে গেলেন আসগর আলি। সর্বনাশ! বন্যার জলে সামনের লাইন ভেসে গেছে। ব্রীজটার উপরে অন্তত দেড় মিটার জল। কে জানে সেখানে লাইন আছে না ধুয়ে গেছে! গাড়ি কোন অবস্থাতেই আর এগোবে না। আরও এগিয়ে উনি সোজা ইনজিনের সামনে এসে দাঁড়ালেন। গার্ড এসে গেছেন ততক্ষণে। ড্রাইভারের সঙ্গে আলোচনা করছেন এখন কি করা উচিত।

পাঞ্জাবীর পকেট থেকে একটা কার্ড বার করে গার্ডকে দেখালেন আসগর আলি। বললেন, 'এখন আপনারা কি করতে চান ? গাড়ি তো সামনে আর এগোবে না।'

গার্ড বললেন, 'যেভাবে জল বাড়ছে, গাড়ি এখানে এমন করে দাঁড় করিয়ে রাখাও ঠিক হবে না। গাড়ি পিছিয়ে যাবে যতদূর পারে।'

ড্রাইভার বললেন, 'পিছনে থ্রি নট ফাইভ প্যাসেঞ্জার আসছে। সে তো সিগন্যাল পেয়ে এসে ঘাড়ে পড়বে।'

গার্ড বললেন, 'হানড্রেড কিলোমিটারের সিগন্যাল পর্যন্ত তো চল। ওটা মাঝাণ্ডিতে পোঁছালে তো গ্রীন হবে। আমার ভয় হচ্ছে জলের যা তোড়, এমব্যাঙ্কমেন্টই না ধসে যায়। তাহলে তো এত যাত্রীর প্রাণ নিয়ে টানাটানি পড়বে।'

আসগর আলি বললেন, 'আমি বলছি, গাড়ি পিছিয়ে নিয়ে চলুন।'

ড্রাইভার বললেন, 'বেশ আমি ইনজিনের হুইসিল দিচ্ছি। আপনারা সবাইকে গাড়িতে চড়তে বলুন। গার্ড সাহেব, আপনি গাড়িতে উঠে সিগন্যাল দিলে আমি গাড়ি পিছাব। চালাব ততক্ষণ যতক্ষণ না আপনি থামার সিগন্যাল দেবেন। যান, আপনারা প্যাসেঞ্জারদের গাড়িতে তুলুন।'

ড্রাইভার গাড়িতে উঠেই ইন্‌জিনের হুইসিল ধরে টান মারলেন। ঝাঁ-আঁ-আঁ করে আবার প্রচণ্ড আওয়াজ উঠল। সঙ্গে সঙ্গে দুলে উঠে গাড়িটা আস্তে আস্তে পিছতে লাগল। চারদিকের যাত্রীরা আবার হৈ চৈ করে গাড়িতে উঠে পড়ল।

গার্ডসাহেব বললেন, 'আপনি আসবেন আমার সঙ্গে আমার গাড়িতে ? তাহলে সুবিধা হয়।'

আসগর আলি বললেন, 'চলুন যাচ্ছি আমি। তবে আমার কম্পার্টমেণ্টে এক মিনিট যাব। সবাইকে বলে আসতে। বোঝেন তো একটা দায়িত্ব আছে ঘাড়ে।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি নিচে দাঁড়াব। চলুন। বিরাট একটা কিছু ব্যাপার নাকি ? নিজে এসেছেন।'

'খুব দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপার একটা, এর বেশী কিছু আপাতত বলা যাবে না। কিন্তু এই বন্যাতো দেখছি আমাদের আরও দুর্ভাগ্যের মধ্যে ফেলল।'

হাসলেন গার্ডসাহেব, 'কুড়ি বছর এলাইনে আছি। বহুবার বন্যা হতে দেখেছি। এমন কাণ্ড এই প্রথম। দুটো নদীই ক্ষেপেছে!'

কথা বলতে বলতে ওঁরা কম্পার্টমেন্টের সামনে এসে পড়লেন। গাড়ি তখন কচ্ছপের

গতিতে পিছিয়েই চলেছে। গাড়ির হাতল ধরে আসগর আলি চাপা গলায় বললেন, 'আমার নাম আসগর আলি। কথাটা ভুলে যাবেন না যেন, আসগর আলি।'

'ও আচ্ছা, আচ্ছা, মনে থাকবে।' হেসে বললেন গার্ডসাহেব।

আধভেজা আবার উনি যখন গাড়ির মধ্যে ঢুকলেন, তখন অনেকেই ওকে ঘিরে ধরল। সবার চোখে মুখে প্রশ্ন। অবনীবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, 'ব্যাপার কি হে?'

'বন্যায় সামনের লাইন ভেসে গেছে। লাইনের মাটি ধ্বসে যেতে পারে বলে গাড়ি পিছিয়ে নেওয়া হচ্ছে। আপনারা কেউ নামবেন না গাড়ি থেকে। নামলে মাঝপথেই পড়ে থাকবেন। দুদিকের জল লাইন ছুঁই ছুঁই। বিপদে পড়বেন।' কথাটা বেশ চেঁচিয়েই বললেন উনি। বলে তাকালেন সেই কোণে বসে থাকা লোকটার দিকে। আতঙ্কভরা চোখে লোকটা তাকিয়ে আছে সামনে।

সন্তু বলল, 'আমরা যদি ইচ্ছা করি হেঁটেও কোথাও যেতে পারব না?'

'দুদিকে দেড় দু-মানুষ সমান জল। সব গ্রাম ভেসে গেছে। যেখানেই যাও এই লাইন ধরেই যেতে হবে। সে তো এই গাড়িটাই যাবে এখন।'

অবনীবাবু বললেন, 'তুমি আর তাহলে নেমো না এখন। শেষে বিপদে পড়বে।'

হেসে আসগর আলি বলল, 'না, না, আমাকে যেতেই হবে দাদা। গাড়ির গার্ড আমার বন্ধু। তাকে এখন সাহায্য করতে হবে। আপনারা কেউ কিন্তু নামবেন না। চলি।' বলে আর না দাঁড়িয়ে সোজা নিচে আবার নেমে গেলেন উনি।

গাড়ি পিছুতে লাগল। সোজা পথে গার্ড সাহেব দুই পাশেই টর্চ নেড়ে নেড়ে সিগন্যাল দিতে লাগলেন। যেদিকে যতদূর দেখা যায়, জল আর জল। পাপান নদী থাকার জন্য ব্রীজের কাছে জল একটু বেশী। তা বলে এদিকেও জল তেমন কম নয়। লাইনের মাটি জলের উপরে হাত খানেকমাত্র মাথা তুলে আছে। পঁয়তাল্লিশ মিনিট সমানে পিছিয়ে গাড়ি একশ কিলোমিটার সিগন্যালের সামনে এসে থামল। যেখানে থামল গাড়ি তার থেকে হাত কুড়ি পিছনে সিগন্যাল। গাড়ি থামতেই গার্ড সাহেব নেমে পড়ে সিগন্যালটা দেখলেন। সর্বনাশ, সিগন্যালের আলো নিভে গেছে। তার মানে মাঝাপুি শুধু নয়, বেটলা জংশনও এই লাইনের আর কোনও খবর পাচ্ছে না। থ্রি নট ফাইভ প্যাসেঞ্জারটা যদি বেটলা জংসন ছেড়ে দিয়ে থাকে। টাইম তো হয়েই গেছে।

'আসুন স্যার, আমাদের আরও অনেকটা পেছুতে হবে।' বললেন গার্ড সাহেব। 'সিগন্যাল ডেড। অন্তত আরও কিছুটা পিছিয়ে গিয়ে প্যাসেঞ্জারটাকে থামাতে হবে। তা না হলে দারুণ এ্যাক্সিডেন্ট ঘটতে পারে।'

ওদের কথার মাঝে ড্রাইভার সাহেব এসে গেলেন। তাকে গার্ডের গাড়িতে থাকতে বলে গার্ড সাহেব আসগর আলিকে নিয়ে আরও পিছিয়ে চললেন বেটলার দিকে। বেটলা ঠিক একশ কিলোমিটার দূরে। মাঝে কোথায় যে কি স্টেশন আছে তা জানেন না আসগর আলি। তাই জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমরা কতদূর পর্যন্ত পিছোব?'

'সম্ভব হলে সুরাইয়া পর্যন্ত। সেটাই আগের স্টেশন। ওখান থেকে জংসনের সঙ্গে যোগাযোগ করে কথা বলতে হবে আমাকে।'

'সুরাইয়া স্টেশন নদীর এপারে না ওপারে?'

'ওদিক থেকে নদী পার হয়ে এসে স্টেশন। আমরা ওখানে যেতে পারব।'

বৃষ্টি থেমেছে ততক্ষণে। কিন্তু ঝোড়ো হাওয়া থামেনি। আকাশ ঘন মেঘে ছাওয়া। চারদিকে সব কিছু ঝাপসা। মাঝে মাঝে টর্চ জ্বেলে ওরা দুজনে যতটা সম্ভব জোর কদমে এগিয়ে চললেন। ঘণ্টা খানেক বাদে দূরে স্টেশন

দেখা গেল তার পরেই আকাশে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে সুরাইয়া নদীর সেতু। এদিকে ওটাই সব থেকে বড় ব্রীজ। গার্ড সাহেব বললেন, 'সর্বনাশ, স্টেশন তো অন্ধকার। তার মানে এখানেও সব কিছু ডাউন। ফোন চলছে কিনা কে জানে।'

ওদের টর্চের আলো দেখে স্টেশনেও কারা যেন টর্চ জ্বেলে সাড়া দিল। তাহলে স্টেশনে লোক আছে। তাড়াতাড়ি প্ল্যাটফর্মে উঠতেই তিন চারজন এসে ওদের ঘিরে ফেলল।

সামনেই স্টেশনমাস্টার, ব্যস্ত হয়ে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'গাড়ি, গাড়ির কি হল ?'

গার্ড বললেন, 'পাপান নদীর ব্রীজ আধা জলের তলে। এমব্যাঙ্কমেণ্ট ধ্বসে পড়তে পারে হঠাৎ। তাই গাড়ি একশো কিলোমিটার সিগন্যাল পর্যন্ত পিছিয়ে এনেছি। এদিকের খবর কি ?'

'সব ডেড। ফোন চলছে না। আলো জ্বলছে না, তবে ভাল খবর এইটুকু, থ্রি-নট-ফাইভকে চাকান্দা হল্টে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়েছে। ও আর এগোবে না।'

'কেন ?' জিজ্ঞাসা করলেন গার্ড সাহেব।

'কেন ?' অবাক হয়ে তাকালেন স্টেশন মাস্টারমশাই, 'কি দেখছেন চারপাশে ? কোয়ার্টার ভেসে গেছে। আমাদের সবাই এসে থার্ড ক্লাস ওয়েটিংরুমে আশ্রয় নিয়েছে। আর সুরাইয়া নদীর ব্রীজ ? তাও কম করে এক দেড় মিটার জলের তলে। আমরাও ভয় পাচ্ছি স্টেশনই না ভেসে যায় জলের তোড়ে।'

'মাঝাণ্ডি আর বেটলা জংশনে আমাদের অবস্থার কথা জানে ?' জিজ্ঞাসা করলেন আসগর আলি।

স্টেশনমাস্টার ওঁর প্রশ্ন শুনে মুখ তুলে তাকালেন গার্ড সাহেবের দিকে।

গার্ড সাহেব বললেন, 'ইনি অরুণ রায়। ইনিস্পেক্টর জেনারেল অব পুলিস, বেটলা। এখন আসগর আলি নামে পরিচিত। কোনও জরুরী কাজে এই যাচ্ছিলেন। আমিই ওঁকে সঙ্গ দিতে বলেছি।'

স্টেশনমাস্টার বললেন, 'মাঝাণ্ডি বেটলা দুপক্ষই জানে আমাদের অবস্থা। দুদিকের ব্রিজ ডুবেছে সে খবরও দিয়েছি। লাইন চালু ছিল এই তো ঘণ্টা খানেক আগে পর্যন্ত। আপনাদের গাড়ি যে হাণ্ড্রেড কিলোমিটারের কাছাকাছি হারিয়ে গেছে সে খবরও দেওয়া হয়েছে দুপক্ষকে। এখন তারা যে কি করবেন তা আমরা বুঝতে পারছি না। বিপদ শুধু ঝমঝমা এক্সপ্রেসের প্যাসেঞ্জার আর এই স্টেশনের স্টাফদের। মোট তিনশো মত লোক হবে। কে আর তেমন করে ভাববে তাদের কথা বলুন ?' স্টেশন মাস্টার মশাইয়ের গলায় ভয়ের সুর।

আসগর আলি বললেন, 'না, না, অত ভাববেন না। দুদিক যখন খবর পেয়েছে নিশ্চয়ই কিছু করবে।'

'কি করবে স্যার ? কে যে কোথায় আছে তাই ওরা জানে না। এখানে আমরা আর ওখানে আপনারা।'

একটু ভাবলেন আসগর আলি। বললেন, 'আপনারা কেউ কি বলতে পারেন এই লাইনের মধ্যে কোন জায়গাটা সব থেকে উঁচু ?'

একটু না ভেবেই স্টেশন মাস্টার মশাই বললেন, 'সে তো ওই একশ কিলোমিটার ডিস্টাণ্ট সিগন্যালটার কাছেই। সব থেকে নিচে এই স্টেশন, আর পাপান নদীর ধার। দুই দিকে দুই নদীর পার।'

'স্টেশনে আপনারা সবশুদ্ধ কত জন আছেন ?'

'তা হবে জনা চব্বিশ। স্টাফ আর যাত্রী নিয়ে।'

'হেঁটে যেতে পারবেন আপনারা গাড়ির কাছ পর্যন্ত ? এই নিচু জায়গা ছেড়ে যাওয়াই ভাল।'

'তা পারব না কেন যেতে। প্রাণ বাঁচাবার জন্য যেতেই হবে। কিন্তু আমার মা। তাঁর বয়স প্রায় নব্বুই। তিনি চলাফেরা করতে পারেন, কিন্তু অতদূর হেঁটে যেতে কি পারবেন ?

'তাঁকে আমরা বয়ে নিয়ে যাব '

ওর কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই পিছন দিকে ভীষণ শব্দ করে কি যেন ভেঙ্গে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে কে যেন উৎকটভাবে চেঁচিয়ে উঠল, 'মাষ্টারজী, মাষ্টারজী বাত্তিঘর গির পড়া, পানি পালিটফর্ম তক আ গিয়া।'

আসগর আলি চেঁচিয়ে উঠলেন, শীগ্গির করুন, তাড়াতাড়ি করুন। মা কোথায় ? তাঁকে তুলে নিন। চলুন চলুন, এখুনি স্টেশন ছেড়ে সবাই হাঁটা দিন একশো কিলোমিটারের দিকে।'

হৈ হট্টগোল সুরু হয়ে গেল স্টেশনে। দেখতে দেখতে সবাই তাদের মালপত্র ঘটি-বাটি নিয়ে তৈরি হয়ে পড়ল।

আসগর আলি ধমক দিয়ে সবাইকে রেল লাইনে নামিয়ে দিলেন। সবাই চলতে আরম্ভ করলে স্টেশনমাস্টারমশাইকে বললেন, 'চলুন কোথায় আপনার মা ?'

স্টেশনের ঘরে তালা দিলেন মাস্টারবাবু। ক্যাশ টাকা গুনে জামার পকেটে নিলেন।

তারপর একটা বেঞ্চের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। আসগর আলি দেখলেন, সেখানে এক বৃদ্ধা বসে আছেন। ওদের দেখে তিনি বললেন, 'বাবা, আমি হেঁটেই যেতে পারব। তোমরা কেউ আমার সঙ্গে থেকো তাহলেই হবে।'

কোমর বাঁকা উনি লাঠি হাতে আস্তে আস্তে প্ল্যাটফর্মের দিকে এগোতে লাগলেন। স্টেশন মাস্টারবাবু বললেন, 'মা এঁর নাম আসগর আলি। তোমাকে বয়ে নিয়ে যাবেন বলে ইনিই এগিয়ে এসেছেন।'

বুড়িমা বললেন, 'বাবা, তোমার অনেক দয়া বাবা, ভগবান তোমার মঙ্গল করুন। আমি আস্তে আস্তে চলব। সঙ্গে থেকো।'

অন্যরা তখন গার্ড সাহেবের সঙ্গে অনেকটা এগিয়ে গিয়েছে। তাদের কথা ভেসে আসছে। আলো দেখা যাচ্ছে মাঝে মাঝে। ওরাও তিনজনে নেমে পড়লেন লাইনে।

বুড়িমা বললেন, 'এমন যে হতে পারে তা তো কখনও ভাবিনি বাবা। এতো আমাদের সেই পূর্ববঙ্গের বন্যার মত। কি যে করছে দেশের সরকার কে জানে। কবে যে এর শেষ হবে কে জানে।'

ওর একথার কেউ কোনও উত্তর দিল না। উনিও বাঁকা কোমরে লাঠি ঠক্ ঠক্ করে আস্তে আস্তে এগিয়ে চললেন। সামনেই বাঁ ধারে একটা ঝোপ তার কাছে পৌঁছতেই স্টেশনমাস্টারবাবু চেঁচিয়ে উঠলেন 'কে, কে ওখানে?' বলে হাতের টর্চটা জ্বেলে উনি ঝোপের উপরে ফেললেন।

আসগর আলি অবাক হয়ে দেখলেন সেই লোকটা, যে কম্পার্টমেন্টের এককোণে একলা বসে কাঁদছিল। সে দাঁড়িয়ে সামনে, ওর চোখে মুখে কেমন যেন একটা ভীষণ হতাশা মাখান।

'ওদিকে কোথায় যাচ্ছেন আপনি?' ব্যস্ত হয়ে মাস্টারমশাই জিজ্ঞাসা করলেন।

লোকটা বিড় বিড় করে কি যেন বলল, তারপর জোরেই বলল, 'ওদিকে পথ নেই? ওদিক দিয়ে বাইরে চলে যাওয়া যাবে না?'

ধমকে স্টেশনমাস্টারবাবু বললেন, 'তা যদি থাকত, তাহলে আমরা সবাই স্টেশন ছেড়ে এমন করে পালাতাম? ফিরে চলুন ট্রেনে। এখন কদিন ওই ট্রেনটাই হবে আমাদের ঘরবাড়ি।'

লোকটা বলল, 'কিন্তু আমার যে সামনেও লাইন জলের তলায়। এদিকেও তাই। তাহলে কোন দিকে আমি যাব এখন। আমাকে যে যেতেই হবে। বড় বিপদ আমার।'

আসগর আলি বললেন, 'বিপদ আপদ যাই হোক আপনার, ফিরে চলুন।'

লোকটা আবার যেন আপন মনেই বিড় বিড় করে বলল, 'তবে তো যেতেই হবে। যেতেই হবে আমাকে। বাঁচার আমার দারুণ ইচ্ছা। কিন্তু একি হয়ে গেল!'

বুড়িমা বললেন, 'অমন করনা বাবা। অমন করলে মনের জোর যায়। আমার দিকে দেখ, আশির উপর বয়স। আমি তো হাহুতাশ করছি না। চল চল ফিরে চল। এতগুলো মানুষের যা হবে, তোমারও তাই হবে।'

আর কোনও কথা না বলে লোকটা ওদের সঙ্গেই ফিরে চলল। একবার হঠাৎ আপন মনেই বলল, 'ধর্মের কল বাতাসে নড়ে। কে বলেছে এই কথাটা? সব বাজে। সব মিথ্যা! কদিন বাদে জল নেমে যাবে মনে হয়?'

বুড়িমা বললেন, 'সে কে বলতে পারে বাবা। কোথায় বাঁধ ভেঙেছে, তা মেরামত হবে। আটকা জল সরবে তারপর। তবে তো না সব কিছু আবার নড়বে। যা দেখছি, দিন আট দশ লাগবে।'

'আট দশ দিন। উঃ! আট দশ দিন!!' মাথার চুল ধরে ও টানতে লাগল। আর কেউ ওর কথায় সায় দিল না। ওঁরা মুখ বন্ধ করে চলতে লাগলেন। বেশ কিছুটা এসে সেই লোকটা হঠাৎ ফিরে দাঁড়িয়ে আসগর আলিকে জিজ্ঞাসা করল, 'আমি কি আপনাকে চিনি?'

আসগর আলি হেসে বললেন, 'তা চিনতে পারেন? তবে আমি কিন্তু আপনাকে চিনি না।

দেখেছি ট্রেনের কম্পার্টমেন্টে। এক সঙ্গেই আসছিলাম।'

'ও।' বলে লোকটা মাথা নীচু করেই হাঁটতে লাগল।

বুড়িমার চলার গতি কমতে লাগল। সামনে যারা যাচ্ছিল, তারা অনেকটা এগিয়ে গিয়েছে। তাদের হাতের টর্চের আলোও প্রায় মিলিয়ে এসেছে। বুড়িমা লাঠির উপরে ভর দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে হঠাৎ বললেন, 'আর পারছিনা বাবা, এবারে একটু থামতে হবে।'

স্টেশনমাস্টারবাবু বিব্রত হয়ে বললেন, 'আরও একটু চল মা, এই মাইল খানেক। সেখানে কাটা খালের বাঁধন কালভার্ট আছে তার উপরে বসতে পারবে।'

দাঁড়িয়ে থেকেই বুড়িমা বললেন, 'তোমরা এগোও। এগিয়ে যাও, আমার জন্য কাউকে অপেক্ষা করতে হবে না বাবা। আমি আস্তে আস্তে চলে ঠিক পেঁাছে যাব। আর যদি না-ই পেঁাছাই বাবা, তাতে আর কি আসে যায়? আমার তো যাবার সময়ই হয়ে গেছে।'

লোকটা হঠাৎ থমকে থেমে বলল, 'সে কথা কে বলতে পারে? কার যে কখন ডাক আসে তা কে জানে? আপনি আমার পিঠে উঠুন। আমি আপনাকে বয়ে নিয়ে যাব। আসুন।'

বুড়িমা ব্যস্ত হয়ে বললেন, 'না বাবা, কি যে বল, বোঝা হব কেন?

'বোঝা? নিজেই তো নিজের বোঝা হয়ে পড়েছি আমি। কথা বাড়াবেন না, আসুন পিঠে।'

প্রায় জোর করেই বুড়িমাকে পিঠে তুলে নিল লোকটা। তার আগে নিজের কাঁধের ঝোলাটা এগিয়ে দিল আসগর আলির দিকে। আসগর আলি কোন কথা না বলেই সেটা হাতে ধরে নিলেন।

লোকটা বলল, 'ভয় পাবেন না আপনি। মাঠে-ঘাটে লোহা-লক্কড়েরই কাজ করতাম আমি। আমার বোঝা বওয়া অভ্যাস আছে। হাঁপ ধরে গেলে থামব।' হিসাব করে স্লিপারের উপরে পা ফেলে ফেলে ও এগিয়ে গেল। সঙ্গে গেলেন স্টেশনমাস্টার মশাই। তিনি খুবই বিব্রত, লজ্জিত। কারণ বৃদ্ধা যে তাঁরই মা। অথচ তার শরীরে ক্ষমতা নেই যে ওকে পিঠে তুলে নেন।

কিছুটা এগিয়ে স্টেশনমাস্টার মশাই জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনার নাম কি জানতে পারি?' নাম জেনে নিজের অক্ষমতার কথা বলে ক্ষমা চাইবেন ভেবেছিলেন উনি।

লোকটা কিন্তু কোনই উত্তর দিল না, নিঃশব্দে অনেকটা এগিয়ে গেল। পাশে তাকিয়ে দেখলেন স্টেশনমাস্টার মশাই, অবাক কাণ্ড, অরুণ রায় সেই একই জায়গায় ঠায় দাঁড়িয়ে আছেন। হাতের বোঝাটাই উনি মাঝে মাঝে টর্চ জ্বেলে পরীক্ষা করছেন! সঙ্গে সঙ্গে মাথার মধ্যে কেমন যেন করে উঠল ওঁর। কি একটা ভয়ংকর ব্যাপার নিয়েই না চলেছেন উনি এই ট্রেনে। ও থলিটা তো এই লোকটার। তবে কি এই লোকটাই…। আর ভাবতে পারলেন না স্টেশন মাস্টার মশাই। তাড়াতাড়ি হাঁটার গতি বাড়িয়ে বললেন, 'একশো কিলোমিটারের ডিসট্যান্ট সিগন্যাল এখনও অনেক দূর। অত তাড়াতাড়ি করলে হাঁপিয়ে যাবেন আপনি। আস্তে চলুন।'

লোকটা একথারও কোন উত্তর দিল না। বড় বড় পা ফেলে আসগর আলি এসে ওদের পাশে হাজির হলেন। বললেন, 'যাত্রীদের কারও কাছে কোন রেডিও ট্রানজিস্টার আছে কিনা তা গিয়েই দেখতে হবে। বেটলা জংশন, মাঝাণ্ডি আমাদের কথা ভেবে যদি কিছু করেই থাকে তো রেডিওতে খবর বলবে।'

মাস্টারবাবু বললেন, 'হ্যাঁ ঠিক বলেছেন তো। একটা মেলট্রেন পথের মাঝে যাত্রীশুদ্ধু বেমালুম হারিয়ে গেছে, এতো বড় খবর।' রেডিওতে নিউজ হলে বুঝব, আমাদের রেসকিউয়ের কোন না কোনও ব্যবস্থা হবেই। তা না হলে যে কি হবে কে জানে!'

লোকটা হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল, 'রেডিও নিউজ? রেডিও নিউজে কি নারাঙ্গিয়ার কোন খবর শুনেছেন আপনারা? এই গতকাল পরশু?'

'না,' বললেন আসগর আলি, 'ওখানে আর কি খবর হবে যা রেডিওতে তা বলা যাবে? তবে ওখানকার লোকের মুখে শুনেছি; নারাঙ্গিয়া হাইড্রো ইলেকট্রিক প্রজেক্টে নাকি একটা বিশ্রী রকম খুন হয়ে গেছে কদিন আগে। কে এক এ্যাসিট্যাণ্ট ইনজিনিয়ার রবিকুমারকে তারই বন্ধু সহকর্মী রাজেন চন্দ্র খুন করে পালিয়েছে। সামান্য কথা কাটাকাটি হয়েছিল কদিন আগে, তার থেকে এই ব্যাপার। আপনি কি নারাঙ্গিয়ায় ছিলেন নাকি? ব্যাপারটা কি বলুন তো?'

বুড়িমাকে কাঁধে নিয়েই লোকটা থমকে দাঁড়াল হঠাৎ। তা মাত্র ক'সেকেণ্ডের জন্য। আবার চলতে চলতে বলল, 'কোথায় কে কাকে কি করল, আমি তা জানব কি করে? আমি নারাঙ্গিয়ার কোন কথাই জানি না।'

'না ওই যে তখন জিজ্ঞাসা করলেন, নারাঙ্গিয়ার খবর, তাই ভাবলাম···।' বললেন আসগর আলি।

লোকটা আপন মনেই কি যেন বিড়বিড় করতে করতে এগিয়ে চলল।

বুড়িমা বললেন, 'তুমি বাবা আমাকে নামিয়েই দাও। বেশ বুঝতে পারছি আমি বোঝা। বয়স আমাকে বোঝা বানিয়েছে বাবা,

মনে প্রাণে আমি তা হতে চাই না। তোমার ভাল লাগছে না। নামিয়েই দাও।'

লোকটা জিজ্ঞাসা করল, 'কিসে বুঝলেন আমি বিরক্ত হয়েছি?'

'ওই যে বাবা অমন বিড়বিড় করছ। তাতেই বুঝেছি, তোমার ভাল লাগছে না।'

'ও তাই নাকি?' বলল লোকটা, 'আমাকে দেখে এখন সবাই সব কিছু ভাবছে! আমি যেন ছাড়া পাওয়া চিড়িয়াখানার বাঘ! আমার ঘর নেই, বাড়ি নেই, মা নেই, বাবা নেই, ভাই-বোন কিছুই নেই। তাড়া খাওয়া জানোয়ারের মত ছুটে বেড়াচ্ছি। জানেন, আমি বাড়ির সব থেকে ছোট ছেলে। আমার মারও অনেক বয়স হয়েছে। এই হয়ত আপনার মতই হবে।'

'আহা বাবা মার জন্য মন কেমন করছে বুঝি?'

'ছোট বোনটার বিয়ে হয়নি বুঝলেন? আমাকে দারুণ ভালবাসে? সারাক্ষণ ছোড়দা ছোড়দা—আর বোধ হয় ওর সঙ্গে দেখা হবে না! বুঝলেন।'

'ও কি কথা বলছ বাবা, ষাট ষাট। দেখা হবে, বোনের বিয়ে হবে, আনন্দ করবে।...'

'না মা,না,' বাধা দিয়ে লোকটা বলে উঠল, 'ও সব আর আমার জীবনে কিছুই হবে না।' আমি শুধু ছুটে পালাব, পালাব, পালাব। শেষে একদিন ধরা পড়ে যাব। যে পাপ আমি করিনি, করতে পারি না, সে পাপের সাজা পাব। কাউকে বলবেন না মা, বলবেন না। আমি ফেরারী আসামী। পালাচ্ছিলাম। পালাতে গিয়ে এমন ভাবে আটকা পড়ে গেছি।'

'দাঁড়াও।' বললেন বুড়িমা,'দাঁড়াও দাঁড়াও, আমাকে একটু নামিয়ে দাও। দুটো কথা তোমাকে বলব আমি। দাঁড়াও।'

লোকটা দাঁড়াল। বুড়িমাকে নামিয়ে দিল। পিছনের সবাই তাড়াতাড়ি এগিয়ে এল সামনে।

আসগর আলি বললেন, 'মাসিমা, এবারে আপনি আমার পিঠে উঠুন।'

'না বাছা, না। তোমরা এগোও, আমি আর আমার ছেলে পরে আসছি আস্তে আস্তে। কখনও হাঁটব। কখনও ছেলের পিঠে উঠব। এগোও এগোও তোমরা।'

আসগর আলি একটু ইতস্তত করে বললেন, 'সঙ্গেই চলি মাসিমা। একা ও পারবে কেন?'

মাস্টারবাবুও বললেন, 'হ্যাঁ মা, আমাকে তো থাকতেই হবে।'

ভীষণভাবে ধমকে উঠলেন বুড়িমা, 'যা বলি তাই কর তো তোমরা। কেমন লোক গো তুমি? ওদিকে কত লোক জলবন্দী হয়ে পড়ে আছে, তাদের দায়দায়িত্ব কাদের? তা ভাবছ না, আমার জন্য ভাবছ। এগোও, এগোও জোর কদমে। আর তোমাদের ছায়াও যেন আমি না দেখি সামনে।'

হেসে আসগর আলি বললেন, 'চলুন মাস্টারবাবু আমরা জোর কদমে এগোই। সত্যি তো। ওদিকে অনেক কাজ বাকি। মনে রাখবেন সামনে রাত, তারপর কদিন যে এখানে এভাবে থাকতে হবে তারই বা ঠিক কি।'

বেশ অনিচ্ছাসত্ত্বেও মাস্টারবাবু বললেন, চলুন তাহলে।'

[চলবে]

মনে রেখো

জ্যৈষ্ঠ মাসের ধাঁধার উত্তর আষাঢ় মাসের মধ্যে অবশ্যই সন্দেশ কার্যালয়ে পৌঁছন চাই।

ভুলোমানুষ

আশিস মুখার্জী

বিজ্ঞানী এক আইনস্টাইন
সবাই তাঁকে জানি
গল্প শোন কেমন ভুলো
ছিলেন সে বিজ্ঞানী।
তখন তিনি প্রিন্সটনে
গবেষণার ভারে
ব্যস্ত, তবু ঘুরতে গেলেন
একটু পথের ধারে।
ঘুরতে গিয়ে বিজ্ঞানীটির
ফ্যাসাদ হল ভারি
ভুলেই গেলেন কোন পথে আর
কোন ঠিকানায় বাড়ি।

বন্ধু ছিলেন প্রিন্সটনে তাঁর
টেলিফোনেই তাকে
সুধান তিনি, 'আইনস্টাইন
কোন ঠিকানায় থাকে,'
বন্ধু বলেন, 'বলব না তা
বলবে না কেউ, কারণ
আইনস্টাইন করেছেন তো
বলতে সেটাই বারণ।
বিখ্যাত লোক আইনস্টাইন
তাই গিয়ে তাঁর ঘরে
উটকো যতো মানুষ নাকি
বিরক্ত রোজ করে।

এখন তিনি ব্যস্ত কি এক
বিশাল গবেষণায়
এমন কাজের ব্যাঘাত করা
তোমার কি ভাই মানায়!'
আইনস্টাইন দুঃখে বলেন,
'কথাটা বেশ দামি
ওমনি একটি কাজেই তো ভাই
ব্যস্ত আছি আমি।
গবেষণা ছেড়ে হঠাৎ
ঘুরতে হেথায় এসে
নিজের বাড়ির ঠিকানাটাই
ভুলেছি অক্লেশে।'

ন্যাড়া

হিজিবিজবিজ

ন্যাড়া, এই রোদে দেওয়া বড়িগুলো একটু পাহারা দে না বাপ। কাকে যেন না নিয়ে যায়—
এখানে ব'সেই সন্দেশ পড়ি, তাহ'লে পাহারা আর পড়া দু'টোই হ'বে।
ঠকাস
আঁই—
একটা ব্যবস্থা করতেই হ'বে—
গ্যাঁড়াদা আমার মাথার পেছনে জম্পেস ক'রে একটা কাকতাড়ুয়ার ভয়ানক মুখ এঁকে দাও তো
রং
এ আবার কি!
এবার নিশ্চিন্তে সন্দেশ পড়া যাবে।

প্রজাপতিরা আগে গান গাইত

[পাপাগো রেড ইন্ডিয়ানদের উপকথা]

দেবব্রত ঘোষ

বাচ্চারা খেলছে, ছুটছে, নাচছে, গাইছে। মারামারি-আড়ি করছে আবার ভাবও হচ্ছে গলায় গলায়। এক ফুলের বাগানের পাশে, ঘাসে ভরা মাঠে।

ওদের খেলাধুলো দেখছিলেন ভগবান। ভালই লাগছিল। হঠাৎ তাঁর মনটা কেমন খারাপ হয়ে গেল। আচ্ছা, এইসব হাসিখুশি চটপটে বাচ্চারা ত একদিন বুড়ো হয়ে যাবে। ওদের চামড়া কুঁচকে যাবে, চুল হবে সাদা, দাঁতটাত থাকবে না। ফোকলা মুখের কথা বুঝতেই পারা যাবে না। কানে শুনবেনা, চোখেও ঝাপসা দেখবে। মিষ্টি মিষ্টি মেয়েগুলো খুনখুনে বুড়ি হয়ে যাবে। চনমনে সব কুকুরছানারা হবে রোঁয়া-ওঠা খেঁকি কুত্তা।

এই যে রঙবেরঙের কত ফুল, সবই ত শুকিয়ে শুকিয়ে ঝরে যাবে। সবুজ সবুজ পাতাগুলো হলদে হয়ে পড়ে যাবে। শীতকালে যখন বরফ পড়বে, রঙবেরঙের এই পৃথিবীটা হয়ে যাবে একঘেয়ে, জবুথবু।

ভাবতে ভাবতে ভগবানের মন কেমন খারাপ হয়ে গেল।

বাচ্চারা তখনও খেলে চলেছে। হৈ চৈ চেঁচামেচির শেষ নেই। নীল আকাশের নিচে, মাটির উপর, ঘাসের উপর ছায়া নিয়ে আলোর খেলা। ঝরা পাতাগুলোকে একবার এদিক একবার ওদিকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে বাতাস। সবুজ পাতাগুলো দুলে দুলে সায় দিচ্ছে। চারদিকে ফুলের বাহারের শেষ নেই।

ভগবান বাতাস, আলো, ছায়া, আকাশ আর আর ফুল পাতার কাণ্ড দেখে হাসলেন। ভাবলেন যতই শীত আসুক আর বরফ পড়ুক, যতই বুড়ো হোক না মানুষ, এই রঙগুলো সব রেখে দিতে হবে ঠিকঠাক। আমি এমন জিনিস তৈরি করব এবার, যার রঙের বাহারে আমিও সারাবছর খুশি থাকব। বাচ্চা-বুড়ো সবাই মজা পাবে।

ভগবান তাঁর থলির মধ্যে ভরে নিলেন আকাশের একমুঠো নীল, একফালি রোদ। বাচ্চাদের একটুকরো ছায়া, ছোট্ট মেয়ের কুচকুচে চুলের একটুখানি কালো, ঝরে যাওয়া পাতার হলদেটুকু, পাইন গাছের একপাতা সবুজ। হরেক রকমের ফুল থেকে লাল, বেগুনি, কমলা এই সব রঙের একটু একটু।

তারপর কী ভেবে থলির মধ্যে ভরে দিলেন দোয়েল পাখির গান।

থলিটা নিয়ে ভগবান নিজেই এলেন বাচ্চাদের কাছে। নরম ঘাসের উপরে তখনও তারা ছুটোছুটি করছে।

'ছোট্ট সোনা খোকাখুকুরা, এই দেখ না কী এনেছি তোমাদের জন্যে। থলিটা খুলে দেখ।'

বাচ্চারা হুড়মুড় করে ছুটে এল। দিল থলির মুখ খুলে। আর কী মজা, ফুর ফুর করে রঙবেরঙের প্রজাপতি বেরুতে লাগল আর ঘিরে ধরল বাচ্চাদের। তাদের মাথায় পাখা নেড়ে বসল। উড়ে গেল এ ফুল থেকে সেফুলে। আবার ফিরে এল বাচ্চাদের ঘাড়ে মাথায়।

আর কী সুন্দর মিষ্টি গান। সুরে সুরে ভরে তুলল সারা বাগান। বাচ্চাদের সঙ্গে ভগবানও খুশিতে মেতে উঠলেন। প্রজাপতির পিছনে ছুটোছুটি শুরু করলেন।

কোথায় ছিল এক দোয়েল পাখি। উড়ে এসে বসল ভগবানের কাঁধে। 'তুমি এত দুষ্টু কেন গো?'—ভগবানকে বকে দিল দোয়েল। 'আমরা যখন হলাম, তুমি বলেছিলে সব পাখিদের নিজের নিজের গান থাকবে। কেউ কাউকে নকল করতে পারবে না। কিন্তু এখন তুমি কী করলে? আমাদের গান কেন দিয়ে দিলে ওই প্রজাপতির গলায়? নিজের কথা রাখতে পারলে না?

বকুনি খেয়ে ভগবান ত চুপ। 'তাই ত, তাই ত, খুব ভুল হয়ে গেছে।'—ভগবান তাড়াতাড়ি প্রজাপতির গলা থেকে গান সরিয়ে নিলেন।

তারপর থেকেই প্রজাপতিরা শুধু চুপচাপ উড়ে বেড়ায়। শুধু রঙবেরঙের ডানা মেলে উড়ে উড়ে ঘোরে।

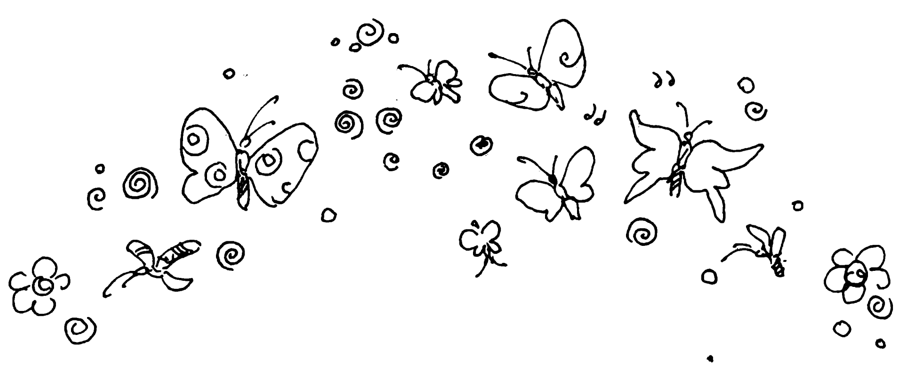

কালাচাঁদ বনাম পাগলা দাশু

কালাচাঁদ কতগুলো ছবি এঁকেছিল ; পাগলা দাশুর সেগুলো ভারি পছন্দ। ঝটপট সেগুলো নকল করে নিল ও। একেবারে হুবহু নকল ! কিন্তু প্রোফেসর নিধিরাম পাটকেলকে দেখাতেই উনি বললেন, 'এ কিহে ! এক একটা ছবিতে অনেকগুলো করে ভুল !' দাশু দেখল ভাল করে, —তাইতো !

একটা ছবি আমরা ছাপলাম। বাঁদিকেরটা কালাচাঁদের আঁকা, ডান দিকেরটা দাশুর। বলতে পারো, ভুলগুলো কী কী ?

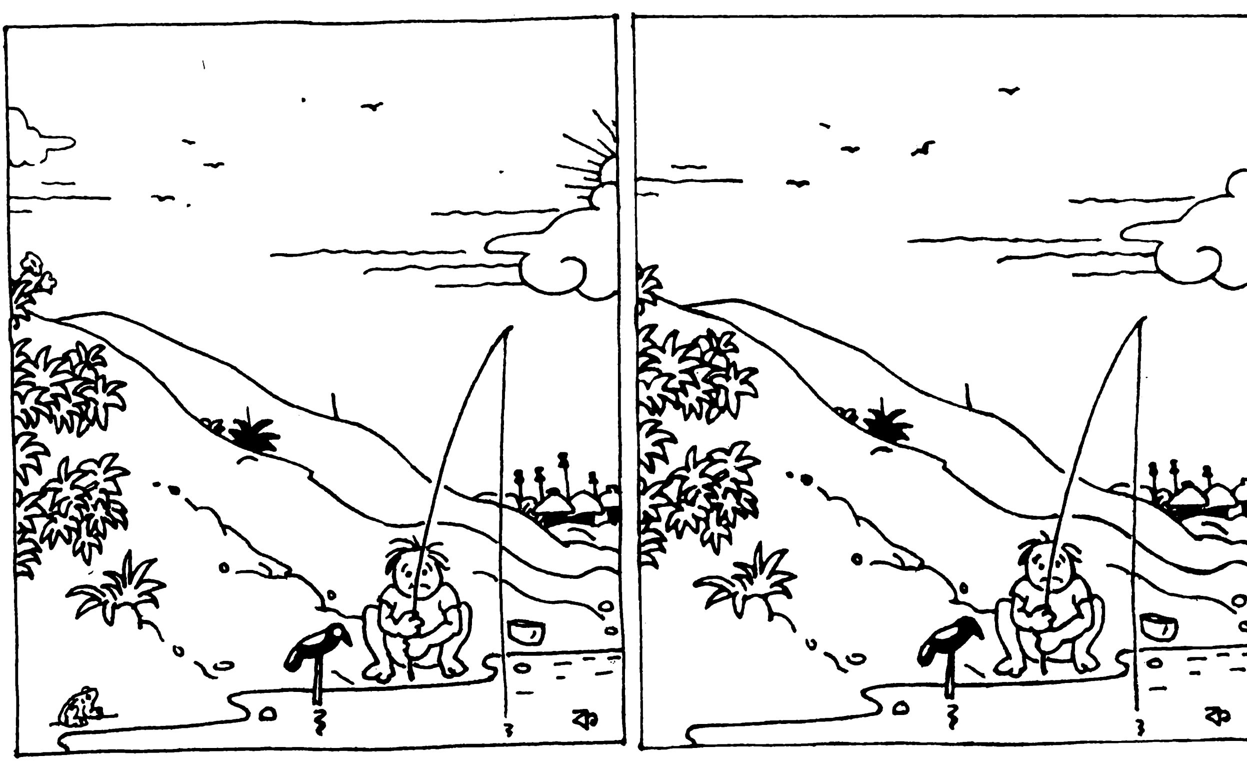

২৭০ পৃষ্ঠায় দেখ

দেয়ালে মুখের আদল

মূল রচনা - ই. ভি. লুকাস
বঙ্গানুবাদ - শবরী চট্টোপাধ্যায়

ড্যানবির ওখানে সেদিন সন্ধ্যেবেলায় বসে, আমরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছিলাম সেই সব ঘটনার কথা, কারণ দিয়ে যেগুলির ঠিক ব্যাখ্যা চলে না। আমরা সকলেই মতটির স্বপক্ষে বিভিন্ন ঘটনার কথা তুলছিলাম, কিন্তু কোনোটাই যেন তেমন যুক্তিগ্রাহ্য হচ্ছিল না। ওখানে উপস্থিত অন্যান্যদের মধ্যে একটি ছোট্ট খাট্ট চেহারার মানুষের দিকে আমার চোখ পড়েছিল। তাঁর উদ্বিগ্ন সাদা মুখটি যেন প্রত্যেকটি বক্তার প্রত্যেকটি কথাই অনুসরণ করছিল, যদিও নিজে কিছুই বলছিলেন না তিনি। অতঃপর ড্যানবি তাঁকে আলোচনায় অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে ডেকে জিজ্ঞেস করল 'আপনার কোন ঘটনার কথা জানা নেই—কারণ দিয়ে যেটার ঠিক ব্যাখ্যা চলে না?'

ভদ্রলোকটি কিছুক্ষণ যেন ভাবলেন—তারপরে বললেন 'মানে এটা ঠিক গল্প নয়, অন্ততঃপক্ষে আপনারা যেমন চাইছেন তেমন কিছুই

নয়। আমার মতে অনেক সত্য ঘটনা বানানো গল্পের তুলনায় শুধু যে অদ্ভুত তাই নয়, অনেক বেশি কৌতূহলোদ্দীপক। একটি ঘটনার কথা আপনাদের আমি বলতে পারি, যেটা আমার জীবনেই ঘটেছে এবং অদ্ভুত ভাবে তার পরিসমাপ্তি ঘটেছে' আজই বিকেলে আমরা সবাই মিলে তাঁকে অনুরোধ করলাম ব্যাপারটা কী আমাদের বলতে।

'প্রায় দু বছর আগে'—তিনি শুরু করলেন 'গ্রেট অর্‌মণ্ড স্ট্রীটের একটি পুরানো বাড়িতে আমি একটা ঘর নিয়ে থাকতাম। শোবার ঘরের দেয়ালটা রং করিয়েছিল আগের এক ভাড়াটে। কিন্তু বাড়িটা ছিল ভিজে স্যাঁত সেঁতে। এই দেয়ালে ছোপ ছোপ দাগ ধরে গিয়েছিল। এই রকমই একটি ছোপ যেন ঠিক একটি মুখের আকৃতি নিয়েছিল। প্রায় প্রতিদিন বিছানায় শুয়ে শুয়ে আমি এই মুখের দিকে তাকিয়েই থাকতাম। একটানা মুখটির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আমার যেন কেমন মনে হতে লাগল, ঐ মুখটির অধিকারী আমার এই ঘরের এক অংশীদার। মজার কথা বিভিন্ন সময়ে দেয়ালের অন্যান্য ছোপগুলি আকার বদল করলেও ঐ মুখওলা ছোপটি যেন একই রকম রইল।

'একবার ইনফ্লুয়েঞ্জাতে আমি শয্যাশায়ী হয়ে পড়লাম এবং বিছানায় শুয়ে শুয়ে কিছুই যখন করার থাকত না, তখন অনেকক্ষণ ঐ মুখটির দিকে তাকিয়ে থাকতাম। এইভাবে ক্রমে ক্রমে মুখটি তার প্রভাব বিস্তার করতে লাগল আমার ওপর। ওটা যেন আমার কাছে ধীরে ধীরে বাস্তব হয়ে উঠতে লাগল। বলতে গেলে আমার রাত দিনের চিন্তার অনেকখানি দখল করে নিয়েছিল ঐ মুখটি। ওর অদ্ভুত বাঁকানো নাক এবং চওড়া কপাল দেখে মনে হত মুখের মালিক একজন অসাধারণ মানুষ, হাজারের মধ্যে খুঁজলে অমন অসাধারণ মুখ হয়তো একটি দেখা যাবে।'

'যাই হোক আমি আস্তে আস্তে ভালো হয়ে উঠলাম, কিন্তু মুখটি যেন আমায় অধিকার করে রইল। আমি যখন রাস্তায় চলতাম তখন চারিদিকে তাকিয়ে ঐ মুখটির আদলের মানুষ খুঁজতাম। আমার কেমন মনে হত ঐ রকম মুখওলা মানুষ আমি নিশ্চয়ই খুঁজে পাব। তার দেখা আমাকে পেতেই হবে। কারণ কেন জানি না ঐ মুখের আড়ালের মানুষটি এবং আমি এক-ই ভাগ্যসূত্রে বাঁধা। যেখানে প্রচুর মানুষের ভিড় হয় আমি সেখানে যেতে আরম্ভ করলাম। যেমন ভিড়ের মধ্যে, ফুটবল খেলার স্টেডিয়ামে রেল স্টেশনে। কিন্তু সবই বিফলে গেল। কিছুতেই তার দেখা পেলাম না। নানা মানুষের মুখ দেখতে দেখতে আমার মনে হতে লাগল—মানুষের মুখ কত রকমেরই না হয়। আবার যদিও বিভিন্ন মানুষের মুখ বিভিন্ন ধরনের হয়, তবুও সবগুলোকেই মাত্র কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়।'

'এই মুখ খোঁজা আমার কাছে একটা নেশার মতো হয়ে গেল। আমি পাগলের মত বাকি সব কিছুই অবহেলা করতে লাগলাম। আমি জনবহুল পথের মোড়ে দাঁড়িয়ে প্রত্যেকটি মানুষের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে লাগলাম। আমার আচরণে আমাকে সবাই পাগল ভাবতে লাগল। পুলিসও আমাকে চিনে ফেলল এবং সন্দেহ করতে লাগল। আমি কিন্তু কোনো মহিলার মুখের দিকে তাকাতাম না, কারণ দেয়ালের মুখটি ছিল পুরুষের মতো।'

এত কথা বলে বক্তা বোধহয় খুবই ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। কপালটা একবার হাত দিয়ে ঘষে নিলেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি আবার শুরু করলেন - 'অবশেষে একদিন আমি তার দেখা পেলাম। সে পিকাডিলি দিয়ে একটা ট্যাক্সি করে যাচ্ছিল। দেখেই তাকে চিনতে পারলাম। একটা খালি ট্যাক্সি পেয়ে চট্‌পট্‌ তাতে উঠে বললাম, 'সামনের ট্যাক্সিটার পেছনে চলো।' ট্যাক্সির ড্রাইভারটি তাই করল। ক্রমে আমরা চেয়ারিং ক্রসে উপস্থিত হলাম। ট্যাক্সি ছেড়ে দিয়ে আমি দৌড়ে প্ল্যাটফর্মে গেলাম। সেখানে

দেখলাম লোকটি দুজন মহিলা ও একটি ছোট মেয়ের সংগে দাঁড়িয়ে আছে। মনে হল তারা ফ্রান্সে যাচ্ছে। লোকটির সংগে কথা বলার জন্যে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে রইলাম। কিন্তু কোনও লাভ হল না। ততক্ষণে তার অন্যান্য বন্ধু-বান্ধবেরাও এসে জুটেছে। তারা সদলবলে একটি কামরার দিকে এগিয়ে গেল।'

'আমি তাড়াতাড়ি ফোক্‌স্টোনের একটি টিকিট কেটে আনলাম। ভাবলাম জাহাজ ধরবার যে নৌকা ছাড়বে তাতেই আমি লোকটিকে ধরতে পারব। কিন্তু ফোকস্টোনে লোকটি আগে ভাগেই একটি জাহাজে উঠে সঙ্গীদের নিয়ে একটা সংরক্ষিত কেবিনে ঢুকে পড়ল। বুঝলাম লোকটি খুবই ধনী। আবার আমার হার হল—কিন্তু আমি ওর সংগে যাবোই বলে স্থির করলাম। আমি জানতাম সমুদ্রযাত্রায় কোনো না কোনো সময় সে নিশ্চয়ই একবার কেবিনের বাইরে আসবে; তখনই আমি ওকে ধরব। আমার কাছে বুলোন পর্যন্ত যাবার মত শুধু একপিঠের ভাড়াই ছিল। কিন্তু তখন যেন কোনো বাধাকেই বাধা বলে মনে হচ্ছিল না।'

লোকটির কেবিনের ঠিক উল্টোদিকে জায়গা করে নিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম কখন সে বাইরে আসে। প্রায় আধঘণ্টা পরে কেবিনের দরজা খুলে গেল এবং লোকটি ছোট্ট মেয়েটিকে নিয়ে বাইরে এল। আমার বুকে যেন হাতুড়ি পড়তে লাগল। কোনও ভুল নেই, এই মুখ আর দেয়ালের মুখ হুবহু এক। লোকটি আমার দিকে একবার তাকিয়ে আপার ডেকের দিকে এগিয়ে গেল। আমি ভাবলাম যা করার এখুনি করতে হবে।'

'মাপ করবেন'—আমি একটু ইতঃস্ততঃ করে বললাম—'দয়া করে আপনার কার্ডটা আমায় একটু দেখাবেন? বিশেষ কারণেই আমি ওটি চাইছি।'

'লোকটির মুখ দেখে মনে হল এমন একটি অদ্ভুত প্রস্তাব শুনে ভারি অবাক হয়ে গেছে, কিন্তু সে আমার অনুরোধ রাখল। আলতো ভাবে পকেট থেকে ব্যাগটি বের করে একটি কার্ড আমার হাতে দিয়ে তাড়াতাড়ি ছোট মেয়েটিকে নিয়ে এগিয়ে গেল। বোঝাই গেল সে আমায় পাগল টাগল কিছু ঠাউরেছে এবং আমাকে না ঘাঁটানোই শ্রেয় মনে করেছে।'

'কার্ডটা শক্ত হাতে চেপে ধরে আমি দ্রুত চলে এলাম জাহাজের একটি নির্জন কোণায়। —আমার চোখে আঁধার ঘনিয়ে এল, আমার মাথা যেন ঘুরতে লাগল, কারণ, কার্ডে লেখা রয়েছে মিস্টার অরমণ্ড ওয়াল, ঠিকানা পিট্‌স্‌বার্গ, আমেরিকা। তারপরে আর আমার কিছু মনে নেই।'

আমার জ্ঞান হ'ল বুলোনের এক হাস-পাতালে। সেখানে নির্জীব অবস্থায় কয়েক সপ্তাহ থাকার পর মাত্র এক মাস আগে আমি ফিরেছি।'

ভদ্রলোকটি চুপ করলেন।

আমরা পরস্পরের দিকে তাকাতে লাগলাম। আজ সন্ধ্যেবেলায় যত কথা হয়েছে তার সংগে এই ছোটখাট নির্জীব মানুষটার কাহিনীর কোন তুলনাই হয় না।

'আমি অর্‌মণ্ড স্ট্রীটে আবার ফিরে গেলাম'—লোকটি কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর আবার শুরু করলেন—'এবং ঐ আমেরিকানটির সম্পর্কে কোথা থেকে কি খবর বার করা যায়—এই কাজেই লেগে গেলাম। পিট্‌স্‌বার্গে চিঠি লিখলাম, বিভিন্ন আমেরিকান কাগজের সম্পাদকদের চিঠি লিখলাম। লণ্ডনে যত আমেরিকান আছে প্রায় সকলের সংগে বন্ধুত্ব করলাম। এত কাণ্ড করেও বিশেষ কিছুই খবর যোগাড় করা গেল না। শুধু জানা গেল যে 'ওয়াল' একজন কোটিপতি, তার মা বাবা ইংরেজ এবং লণ্ডনের বাসিন্দা। কিন্তু কোথায় থাকেন তাঁরা? এ প্রশ্নের আমি কোনও সদুত্তর পেলাম না।'

'এই ভাবেই আরো কিছুদিন কাটল। তারপর কাল সকালে একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছে। আগের

রাতে খুব ক্লান্ত হয়েই আমি শুতে গিয়েছিলাম। ফলে গতকাল বেশ বেলাতে ঘুম ভেঙেছে। ঘুম ভাঙতে দেখি খুব আলোয় ভরে গেছে। অভ্যাস মত দেয়ালের দিকে তাকাতে দেখি মুখটা বেশ ঝাপসা হয়ে গেছে। অথচ গতরাতেও ছবিটা তো স্পষ্ট ছিল।

'আমি খুব অবাক হলাম। দুঃখ হল। বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লাম। সকালের কাগজ ততক্ষণে বেরিয়ে গেছে। তাকিয়ে দেখি বড় বড় হেডলাইন—আমেরিকান কোটিপতির মোটর দুর্ঘটনা। খবরটা নিশ্চয়ই আপনারাও পড়েছেন। তাড়াতাড়ি কাগজ কিনে পড়তে লাগলাম। যা ভেবেছিলাম তাই—পিট্‌স্‌বার্গের কোটিপতি অর্‌মণ্ড ওয়াল সঙ্গীসহ ইটালি সফরকালে আহত হয়েছেন। অন্য একটি গাড়ীর ধাক্কায় তাঁর গাড়ী উল্টে যায়। তাঁর অবস্থা আশংকাজনক।'

'বাড়ি ফিরে বিছানায় বসে দেয়ালের মুখটির দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলাম। দেখতে দেখতে কখন একসময় হঠাৎ মুখটা অদৃশ্য হয়ে গেল।'

'পরে খবর নিয়ে জানতে পারি যে ঠিক ঐ সময়েই মিস্টার ওয়াল মারা যান।'

ভদ্রলোকটি চুপ করলেন।

'সত্যিই কি অদ্ভুত! কি অসাধারণ!!'—আমরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগলাম। আর সত্যিই প্রচণ্ড ভাবে নাড়া খেয়েছিলাম আমরা। 'ঠিক তাই'—অপরিচিত ব্যক্তিটি আবার বললেন—'তবে আমার গল্পে তিনটি অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য আছে। যেমন সুদূর আমেরিকার কোন এক কোটিপতির মুখ ঘরের দেয়ালে ফুটে ওঠা এবং তাঁর জীবনের সংগে সামঞ্জস্য রেখে মুখটির মিলিয়ে যাওয়া, মনে হয় বিজ্ঞান এই ঘটনার সঠিক বা গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা দিতে পারবে না। দ্বিতীয়তঃ ভদ্রলোকের নামের সংগে তাঁর মুখটি যেস্থানে ফুঠে উঠেছিল তার একটা আশ্চর্য সাদৃশ্য (ওয়াল=দেয়াল)।'

আমরা আগন্তুকের সংগে পরোপুরি একমত হয়ে বিপুল উৎসাহের সংগে আবার অতিপ্রাকৃত প্রসঙ্গে ফিরে গেলাম। ইতিমধ্যে অদ্ভুত ঘটনাটির বক্তা উঠে পড়লেন এবং শুভরাত্রি বলে দরজার দিকে পা বাড়ালেন। ঠিক সেই সময়েই আমাদের মধ্যে একজন বলে উঠল, 'আপনি বললেন আপনার গল্পে তিনটি বৈশিষ্ট্য আছে। আপনি মাত্র দুটির উল্লেখ করেছেন। তৃতীয়টা কি তা তো বললেন না'—'ওহ্‌ তৃতীয়টা?' আগন্তুক দরজা খুলতে খুলতে বললেন, 'আমি তো তৃতীয়-টার কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। তৃতীয়টা হচ্ছে আমি মাত্র আধঘণ্টা আগে পুরো গল্পটা মাথা খাটিয়ে তৈরি করলাম। আচ্ছা, পুনঃ শুভরাত্রি।'

অভিনব আইডিয়া

ভবানীপ্রসাদ মজুমদার

তুষার লোকের গল্প পড়েই
ভায়ের হলো সর্দি
আয়ুর্বেদের ছড়া লিখেই
শোনান্ তাকে ছোড়দি !!

ইংলিশে খুব কাঁচা নাতি
তাই দাদু তার বুদ্ধি
গভীর রাতে ভাতের সাথে
খাওয়ান গ্রামার-সিদ্ধ !!

লেখক হবার ভীষণ আশা
শিখতে ভাষা প্রাঞ্জল
বর্নাবিহারী ডিক্‌শনারী
ধুয়ে রোজই খান্ জল !!

নামেতে কি যায় আসে

সুমন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

নামেতে কি যায় আসে
কিবা হয় নামেতে ?
সোনাকে বললে লোহা
পাবে কম দামেতে ?
ঘোড়াকে তো যাই বল
তবু ছোটে জোর সে,
যা খুশি তা বললেও
তেল দেবে সর্ষে ।
শিউলিকে যাই বলো
আশ্বিনে ঝরবেই,
'বক্সার' নামেতে কি
"রিং-'এ ঠিক লড়বেই ।
যে ছেলের নাম বুড়ো
বুড়ো সে কি সত্যি ?
নাম-'ভীম' ; গায়ে জোর
নেই এক রত্তি !
ছেলেটার নাম-'সোনা'
তবু দেখো বিচ্ছু ।
নামেতে কি যায় আসে ?
আসে না কো কিচ্ছু ।।

লেখা আছে বইতে

সুবীর গুপ্ত

কেউ কি জানো লেখা আছে
প্রাচীন কালের বইতে
বেল গাছেতে ব্রহ্মদত্যি
পাকায় বসে পৈতে।

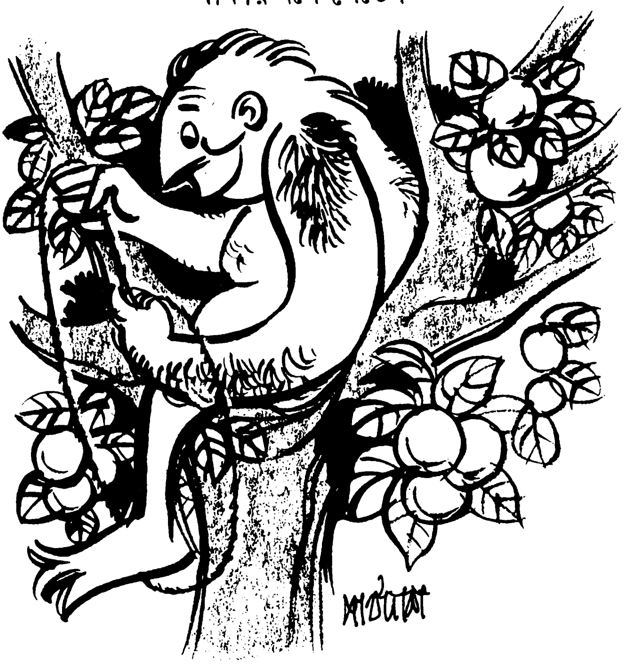

হুমদো মুখো মামদো ভূত
অন্ধকারেই আসে
গভীর রাতে শাঁকচুন্নী
দাঁত খিঁচিয়ে হাসে।

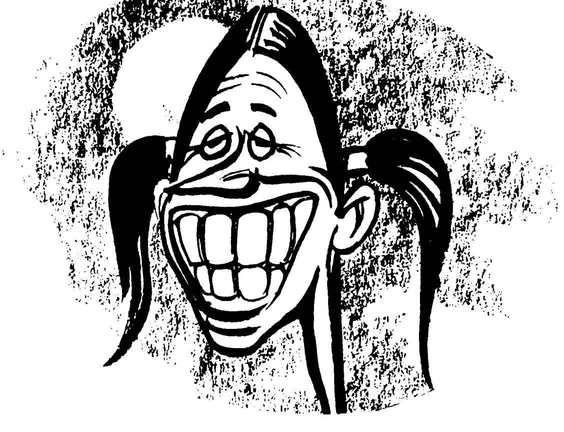

শ্যাওড়া গাছের মগ ডালেতে
গেছো ভূতের বাসা
সেথায় করে গলায় দড়ে
নিত্য যাওয়া আসা।

মাছি ভন-ভন, গা ঘোলানো
পচা মাছের গন্ধে
শ্মশান ঘাটে নাচে মেছো
প্রাণ কাঁপানো ছন্দে।

কানে কানে বলে গেল
সেদিন ব্রহ্মদত্যি
লেখা আছে যা বইতে
সে সব কথা সত্যি।

রথের গল্প

সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায়

সকাল থেকেই পাপুনের মন খারাপ। মৌলালির মোড়ে রথের মেলা দেখতে যাবে বলে সে বাবার কাছে বায়না ধরেছিল। বাবা রাজি হন নি। বলেছিলেন—মেলা দেখতে যাওয়া হবে না পড়াশুনা করগা। পাপুন সেই থেকেই মুখ গোমড়া করে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছিল। হঠাৎ কি মনে হতে পাপুন সোজা দাদুর কাছে গিয়ে হাজির হল। দাদু খবরের কাগজ পড়ছিলেন। পাপুনকে মুখ ভার করে ঘরে ঢুকতে দেখে কাগজ থেকে চোখ তুলে তাকালেন তার দিকে ; শুধোলেন—'কি ব্যাপার পাপুন বাবু, সকাল বেলা পড়াশুনো না করে ঘুরে বেড়াচ্ছ যে বড় ?'

'দেখনা দাদু, বাবাকে বলেছিলাম—মৌলালি-তে রথের মেলা দেখতে যাব। বাবা না করে দিল। বলল—যাও পড়াশুনো করগে। তুমিই বল দাদু, খালি খালি পড়তে কারও ভাল লাগে ?'

দাদু চশমাটা নাকের ওপর ভাল করে বসিয়ে নিয়ে বললেন—'নিশ্চয় না। তা ঠিক আছে, কয়েকটা প্রশ্নের যদি তুমি ঠিক ঠিক উত্তর দিতে পার, তাহলে আমিই বিকেলে তোমাকে রথের মেলায় নিয়ে যাব।'

পাপুন গোমড়া মুখে উত্তর দিল, 'যদি পারি, তাহলে ঠিক নিয়ে যাবে কথা দিচ্ছ ?'

'কথা দিচ্ছি নিয়ে যাব। তার আগে কিন্তু প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে হবে।'

পাপুন সম্মতি সূচক মাথা নাড়ল।

দাদু শুধোলেন—'বলত ভাই—সব থেকে বড় রথের উৎসব কোথায় হয় আর কখন হয় ? সেই মেলায় কটা রথ থাকে এবং তাতে কজন ঠাকুর থাকে ? তাদের নাম কি ? সেই রথগুলো কত বড় ?'

পাপুন চুপচাপ প্রশ্নগুলো শুনে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল—'সব থেকে বড় রথের মেলা হয় পুরীতে। একটাই রথ থাকে আর তাতে জগন্নাথ ঠাকুরের মূর্তি থাকে। সেই ঠাকুরের আবার দুটো হাত নেই। আর বাকিগুলোর উত্তর জানি না।'

দাদু একটু হেসে বললেন—'তুমি দুটো উত্তর ঠিক দিয়েছ। তার জন্য তোমার চার পয়েন্ট হল। বাকিগুলোর উত্তর তো জান না কাজেই তোমার আর মেলা দেখতে যাওয়া হল না।'

পাপুন ততক্ষণে মরীয়া হয়ে উঠেছে। সে বলল—'দাদু, আমি না হয় ছোট ছেলে তাই জানি না। তুমি তো জান, বলে দাও না কেন ? আমি স্কুলে বন্ধুদের গিয়ে শুধোব, তারাও বলতে পারবে না। তখন আমি তাদের উত্তরগুলো বলে চমকে দেব।'

'তা না হয় দেবে, কিন্তু রথের মেলা দেখতে যাওয়ার কি হবে ?'

পাপুন কোন উত্তর দিল না।

দাদু একটু থেমে বললেন—'ঠিক আছে, আমি বলছি।'

'ওড়িশা রাজ্যের পুরীতে প্রতি বছর আষাঢ় মাসের শুক্ল পক্ষের দ্বিতীয়া তিথিতে রথযাত্রা উৎসব হয়। সেটাই রথের সব থেকে বড় মেলা। এই রথের মেলা সম্পর্কে একটা গল্প আছে।

অনেক দিন আগে ইন্দ্রদ্যুম্ন বলে একজন রাজা ছিলেন। তিনি একবার একটা যজ্ঞ করেন। যজ্ঞের শেষে তিনি দেখেন সমুদ্রে একটা কাঠের গুঁড়ি ভেসে এসেছে। রাজা ভাবলেন এই কাঠের গুঁড়িটা দিয়ে তাঁর আরাধ্য দেবতার একটা মূর্তি গড়লে হয়। এমন সময় একজন বুড়ো লোক এসে বলল—'মহারাজ আমি আপনার মূর্তি গড়ে দিতে পারি যদি আমাকে একুশ দিন সময় দেন। আর কাজের সময় যদি আমাকে কেউ বিরক্ত না করে, তাহলেই হবে।' মহারাজ তাকে আশ্বাস দিলেন তাকে কেউ বিরক্ত করবে না। সেই লোকটি এরপর কাজ শুরু করে দিল। দেখতে দেখতে একুশ দিন পার হয়ে গেল। কিন্তু লোকটি আর দরজা খোলে না। একদিন মহারাজ ব্যস্ত হয়ে দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকে দেখলেন একটি নয় তিনটি মূর্তি অসমাপ্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। মহারাজ আর কি করেন তিনি সেই মূর্তি তিনটিকেই রথে তুলে নিয়ে গেলেন মন্দিরে, সেই থেকেই রথ যাত্রা উৎসবের শুরু।

'এই রথ যাত্রায় থাকে তিনটি রথ। তার প্রথমটিতে থাকে বলভদ্র, দ্বিতীয়টিতে থাকে সুভদ্রা ও তৃতীয়টিতে থাকে জগন্নাথের মূর্তি। রথযাত্রার দিন এই রথ তিনটি প্রায় দেড় মাইল রাস্তা পেরিয়ে যায় গুণ্ডিচা মন্দিরে। ঐ মন্দিরটিকে বলা হয় জগন্নাথের মাসির বাড়ি। সেখানে সাতদিন থাকার পর আবার রথ তিনটি তাঁদের আসল মন্দিরে ফিরে আসে। এই ফিরে আসাটিকে বলা হয় উল্টোরথ।

'জগন্নাথদেবের রথের নাম—নন্দী ঘোষ। রথের উচ্চতা—৪৫ ফুট। এতে থাকে ১৬টি চাকা। প্রতিটি চাকার ব্যাস ৭ফুট। ১৬টি চাকা আবার ১৬টি জিনিসের প্রতীক। দাঁড়াও তোমাকে আরো ভালো করে সব বুঝিয়ে বলছি।' দাদু চেয়ার থেকে উঠেআলমারী খুলে একটা মোটা মতন বই বার করে আনলেন। কয়েকটা পাতা উল্টিয়ে তিনি আবার বলতে শুরু করলেন 'এই ষোলটি জিনিস হল—পঞ্চভূত অর্থাৎ ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ও ব্যোম। ক্ষিতি—পৃথিবী অপ - জল তেজ—শক্তি মরুৎ—বাতাস ব্যোম—আকাশ পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়—চোখ, কান, নাক, জিভ, ও ত্বক। পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়-পানি, উপস্থ, পায়ু, পাদ, ও বাক্ এছাড়া মন। জগন্নাথ দেবের রথের ৩২টি অংশ এবং তাতে আছে ৭৪২টি কাঠের টুকরো। রথের চালক মাতলি। রথের ঘোড়া গুলির নাম—শঙ্খিকা, রোচিকা, মোচিকা ও জ্বালিনী। এসব ছাড়াও রথের সঙ্গে থাকে অনেক দেব দেবী।

বলভদ্রের রথের নাম—তালধ্বজ। রথের উচ্চতা—৪৪ ফুট। চাকা ১৪টি। রথ তৈরি হয় ৭৩১টি কাঠের টুকরোয়। সারথির নাম—দারুক। ঘোড়া গুলির নাম—স্থিরা, ব্রতি, স্থিতি, ও সিদ্ধা।

সুভদ্রার রথের নাম—পদ্মধ্বজ। উচ্চতা—৪৩ ফুট, চাকা ১২টি। এটি তৈরি করতে ৭১১টি কাঠের টুকরো লাগে। সারথি-দেবদত্ত। ঘোড়া গুলির নাম—প্রজ্ঞা, অনুজ্ঞা, ঘোরা ও অঘোরা।

জগন্নাথদেবের রথের রঙ হলুদ। সারথি মাতলির পোষাকের রঙও হলুদ। বলভদ্রের রথের রঙ—নীল। সারথি দারুকের পোষাকের রঙ কিন্তু সবুজ। সুভদ্রার রথের রঙ গাঢ় লাল। সারথি দেবদত্তের পোষাকের রঙ কালো। রথের ঘোড়াগুলির রঙও আলাদা আলাদা—যেমন সাদা, লাল ও কালো।'

পাপুন এতক্ষণ মন দিয়ে শুনছিল। সে এবার প্রশ্ন করল—'দাদু রথ কি প্রতি বারেই তৈরি হয়।'

'হ্যাঁ, রথ প্রতি বছরই নতুন করে তৈরি হয়। আর উৎসব শেষ হয়ে গেলে রথগুলি নীলামে বিক্রি করা হয়। একবার রেভারেণ্ড পেগস্ বলে একজন সাহেব পাঁচ টাকা দিয়ে রথের একটি চাকা কিনেছিলেন।'

'তাহলে দাদু—রথ কবে থেকে তৈরি করতে শুরু করে? অত কাঠ তাহলে কি বন থেকে কেটে আনতে হয়?' পাপুন আবার প্রশ্ন করল।

'নিশ্চয়ই। তবে ইদানিং ওড়িশা সরকারের বনবিভাগ রথ তৈরির জন্য কাঠ দেন। রথ প্রতি বছর বৈশাখ মাসে অক্ষয় তৃতীয়ার দিন তৈরি করা শুরু হয় আর চলে রথ যাত্রার আগের দিন অবধি।'

পাপুন বলল—'কিন্তু দাদু তুমি যে রথ নিয়ে বলার সময় বললে—রথে আরও অনেক কিছু থাকে। সেগুলো কি?' দাদু বললেন—'সেগুলো তুমি আর একটু বড় হও তারপর জানবে। হাতের বইটা দেখিয়ে বললেন—এরকম মোটা মোটা বই পড়তে পারলে তবেই জানতে পারবে, নাহলে নয় কিন্তু—'

পাপুন এবারও মাথা নাড়ল। দাদু তাঁর হাতের সেই মোটা মতন বইটা বন্ধ করে টেবিলের এক পাশে সরিয়ে রাখলেন।

পাপুন কে শুধোলেন—'বল তোমার আর কি প্রশ্ন আছে? পাপুন বলল—'না আর কোন প্রশ্ন নেই। কিন্তু মেলা দেখতে যাবার কি হবে?'

দাদু গম্ভীরভাবে কিছু একটা চিন্তা করে বললেন—'সেটা একটা সমস্যা বটে। আচ্ছা ঠিক আছে—তুমি যে এতক্ষণ দুষ্টুমি না করে বসে বসে আমার কথা শুনেছ আবার মাঝে মাঝে প্রশ্ন করেছ, তার পুরস্কার হিসাবে আমিই তোমাকে বিকেল বেলা রথ দেখতে নিয়ে যাব।' কি খুশি তো?

এতক্ষণে পাপুনের মুখে হাসি ফুটল। সে আনন্দে লাফাতে লাফাতে বলল—'খুব খুশি। কিন্তু দাদু বাবা বকবে না তো।'

'যাতে না বকে সে ব্যবস্থা করলেই হবে।'

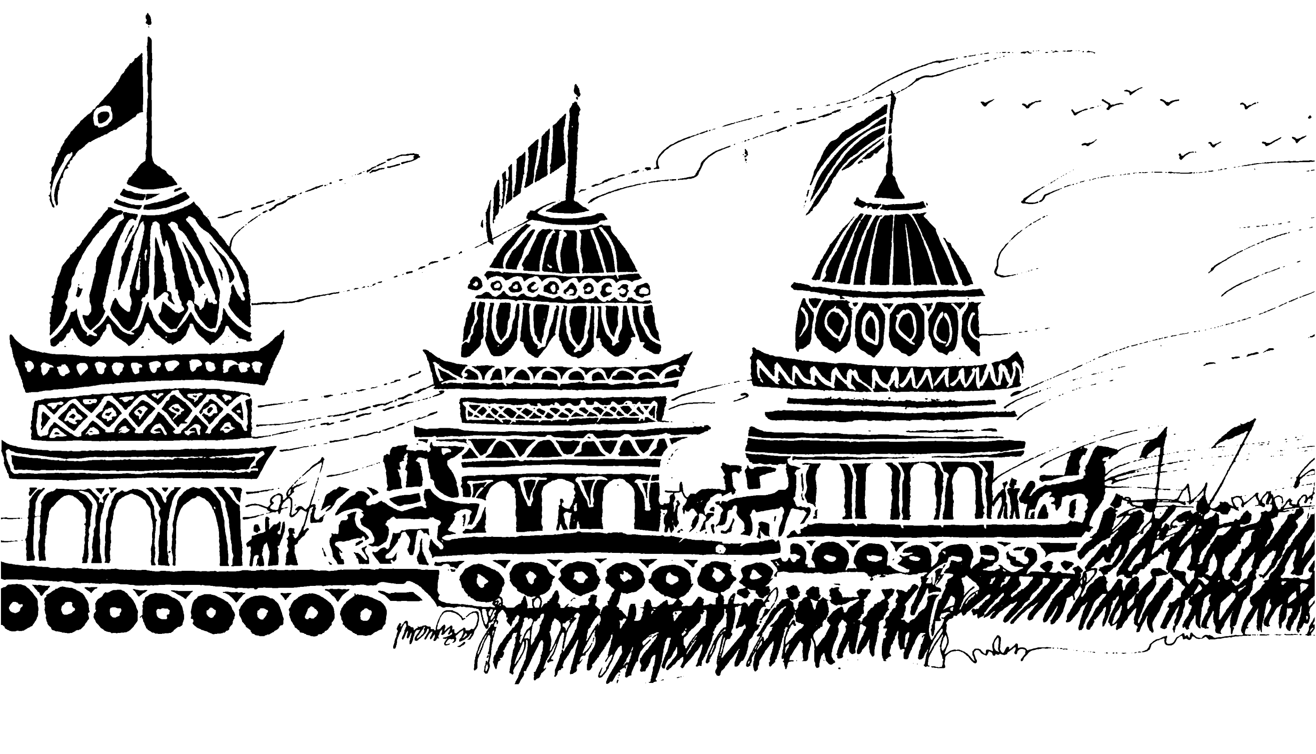

মন্দ ভাগ্য

সুখেন্দু মজুমদার

মেঘ গুড় গুড় সারাটা দিন
বৃষ্টিরা দেয় হানা,
রাস্তা জুড়ে বইছে নদী
ভিজছে শালিকছানা।

শালিকছানা মজায় আছে
কেউ বকে না তাকে,
আমি একটু বাইরে গেলে
অমনি দিদি ডাকে।

অংক খাতার নৌকা আমার
করেছি বেশ পোক্ত,
জলে ডোবা পথ পারাপার
করতে পারে লোকতো!

কিন্তু আমি ভাসাই কখন?
জুটছে বকা ভাগ্যে,
অফিস ফেরত বাস না পেয়ে
আটকে বাবা থাকগে।

বাদলের বাদ্য

শ্রীকর নন্দী

চড়বড়্ চড়বড়্ এলে শিলা-বিষ্টি
পড়ে যায়; ছুটোছুটি বাধে অনাছিষ্টি!
ঠাঁই খোঁজে সব্বাই গা-মাথা বাঁচাতে!
খেতে কেউ ভুলে যায়; ভোলে কেউ আঁচাতে!!

ঝম্‌ঝম্ ঝম্‌ঝম্ একটানা বিষ্টি!
ইলিশের ঝালে ঝোলে জমে ওঠে ফিস্টি!!
প্রাণ ভোরে শ্বাস টেনে, শুঁকে সোঁদা গন্ধ,
নাটু শুধু খোঁজ করে কবিতার ছন্দ!!

ঝির্‌ঝির্ বিষ্টিটা রাত-দিন ঝরলে;
খাল-বিল, নদী-নালা, ঘোলা জলে ভরলে;
শোল-বো'ল, ল্যাটা-কই খেলে মহানন্দে!
ওৎ পাতে জল-ঢোঁড়া শিকারের গন্ধে!!

টিপ্‌টিপ্ টিপ্‌টিপ্ গুড়ি-গুড়ি বিষ্টি,
ভুঁই ফোঁড় ভুঁই চাঁপা দ্যাখে মেলে দিষ্টি।
সাঁই-সাঁই বাদলের এলোমেলো বাতাসে,
হেলেদুলে মানকচু নাড়ে তার পাতা সে!!

ন্যাড়া

হিজিবিজবিজ

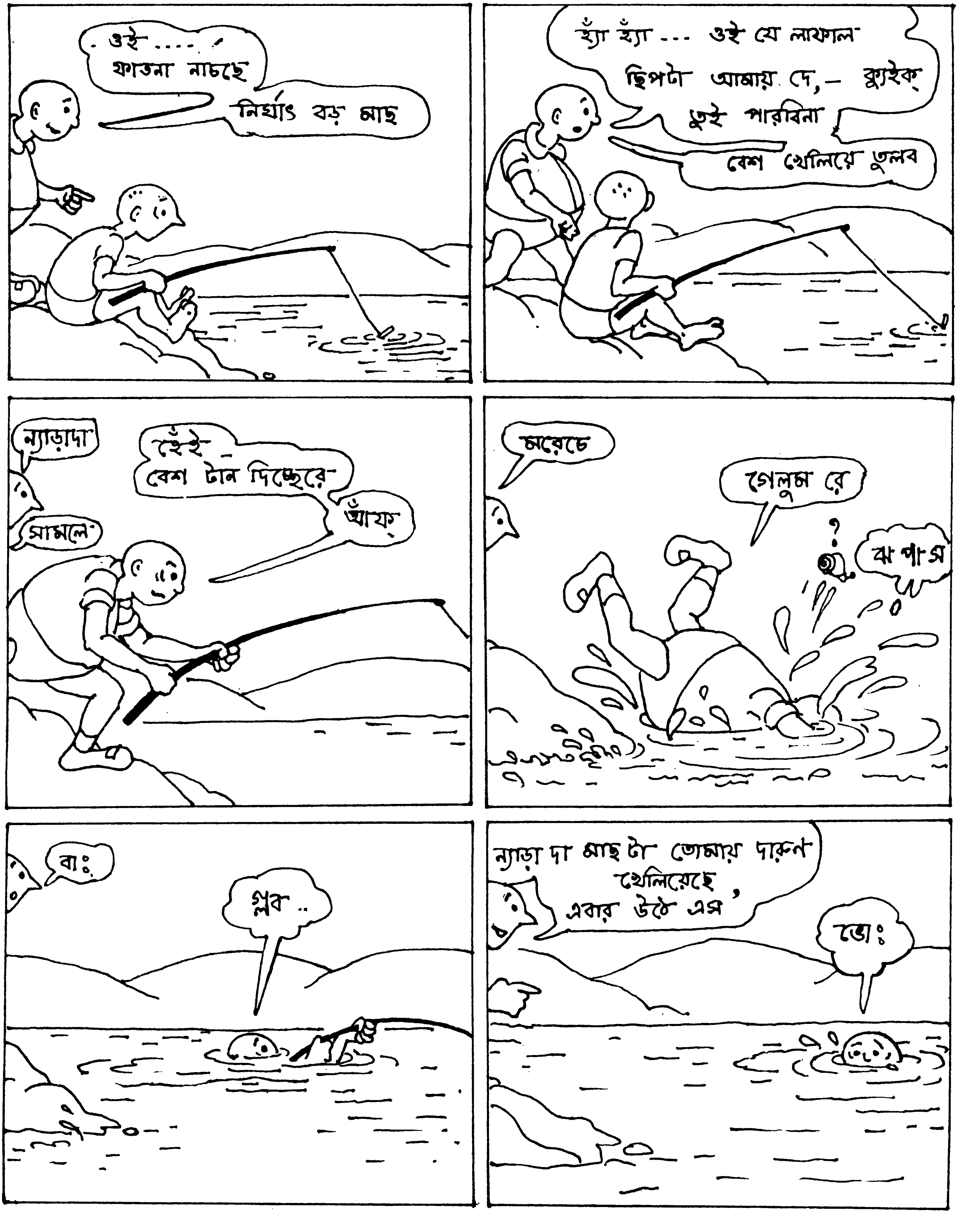

ওই ..... ফাতনা নাচছে
নির্ঘাৎ বড় মাছ
হ্যাঁ হ্যাঁ --- ওই যে লাফাল ছিপটা আমায় দে, – ক্যুইক্ তুই পারবিনা
বেশ খেলিয়ে তুলব
ন্যাড়াদা
হুঁই বেশ টান দিচ্ছেরে
আঁফ্
সামলে
মরেচে
গেলুম রে
ঝপাস
বাঃ
গ্লব ..
ন্যাড়া দা মাছ টা তোমায় দারুণ খেলিয়েছে, এবার উঠে এস
ভোঃ

অবদান

রীতা রায়

জেরুজালেমে রাজা সলোমনের প্রাসাদ তৈরি শেষ হলে রাজা এক বিরাট ভোজসভার আয়োজন করলেন। যে মিস্ত্রীরা প্রাসাদ তৈরী করেছিল, তারা সেই ভোজসভায় নিমন্ত্রিত হল। অতিথিরা সবাই এলে রাজা হঠাৎ বললেন, 'আমি, জানতে চাই এই প্রাসাদ তৈরি করার পেছনে কার অবদান সবচেয়ে বেশি ?'

একজন মিস্ত্রী দাঁড়িয়ে বলল, 'আমরা দিনের পর দিন অক্লান্ত পরিশ্রম করে এই প্রাসাদ গড়ে তুলেছি। পাথর কেটে এটি তৈরি করেছি আমরা। আপনি লক্ষ্য করে দেখুন এর দেয়াল কত মজবুত। অনেক বছর ধরে এই প্রাসাদ আপনার অসাধারণ কীর্তির সাক্ষ্য বহন করবে।'

অন্য এক মিস্ত্রী বলল, 'প্রভু, এই প্রাসাদের প্রত্যেকটি কারুকার্য আমাদের সবার পরামর্শ অনুযায়ী হয়েছে। আমাদের অবদানই যে এই প্রাসাদ তৈরির পেছনে কাজ করছে তাতে সন্দেহ নেই।

একজন কামার বলল, 'আমার কিছু বক্তব্য আছে, প্রভু।'

রাজা তাঁর দিকে চেয়ে বললেন, 'বল তুমি কী বলতে চাও ?'

কামার বলল, 'এই প্রাসাদ গড়ে তোলার পেছনে আমার অবদান সবচেয়ে বেশি।

রাজা অবাক হয়ে বললেন, 'কেন ?'

'প্রভু, আমি যদি লোহা দিয়ে কুড়ুল তৈরি করে না দিতাম তাহলে ওদের ক্ষমতা ছিল না পাথর কাটার। ওরা কি হাত দিয়ে পাথর কাটতে পারত ? আমি কুড়ুল তৈরি করে না দিলে এই প্রাসাদ মাথা তুলে দাঁড়াতে পারত না।'

রাজা কিছুক্ষণ ভেবে বললেন, 'ঠিক, আমি স্বীকার করছি এই প্রাসাদ গড়ে ওঠার পেছনে ওদের অবদান থাকলেও, তোমার অবদানই সবচেয়ে বেশি।'

পতিত ও ম্যান্যুয়েলপেড্রো

শিশির বিশ্বাস

উঁচু একটা কাঁচা রাস্তা নদীর ধার বরাবর গিয়ে মিশেছে, পাকা সড়কের সাথে। পুরোন কেল্লার পরিত্যক্ত লাইটহাউসের পাশ দিয়ে আর একটা উঁচু কাঁচা রাস্তা গেছে খালের দিকে। দুয়ের মাঝে খানিকটা নিচু জমি। ভরা জোয়ারের সময় নদীর জল একটা কাটা নালা দিয়ে ঢুকে পড়ে ভেতরে। সেই সাথে মাছ। জোয়ার শেষে ভাঁটা শুরু হতে পূবপাড়ার ছিদাম মণ্ডলের ছেলে পতিত তার ক্ষুদে হাত দুটো দিয়ে নালার মুখে লাগান কাঠের দরজাটা বন্ধ করে দেয়। ভাঁটার জল অন্য আর একটা পথে হু-হু করে নেমে যায়। মাছগুলো আটকে পড়ে।

রাস্তার ঢালে খেজুরগাছটার পাশে ছোট্ট একটা খড়ের চালা। পতিতের আস্তানা। মাছ পড়ুক আর নাই পড়ক, সারাদিন পাহারা দিতে হয়। রাত দিন মিলিয়ে দুটো জোয়ার। কেজিটাক মাছও ধরা পড়ে না আজকাল। কাজটা আগে ছিদাম মণ্ডলই দেখাশোনা করত। কিন্তু ঐ সামান্য আয়ে সংসার চলে না। ছিদামকে তাই মাইল বারো দূরে নগাছিতে মাটি কাটার কাজে যেতে হয়েছে। অগত্যা স্কুল ছাড়তে হয়েছে পতিতকে। বারো বছরের ছেলে পতিত কাজগুলো বেশ ভালই রপ্ত করে নিয়েছে। কখন জোয়ার ভাঁটা শুরু হবে এখন আর তা ওকে জলের টান দেখে বুঝতে হয়না। আকাশের সূর্য দেখেই বলে দিতে পারে। রাত্তিরে তারা। আসলে সব ব্যাপারই বেশ চটপট বুঝে নিতে পারে পতিত। স্কুলে যখন যেত তখনো ক্লাসে মাস্টার মশায়ের পড়ান বিষয়গুলো চটপট ধরে নিতে পারত। ক্লাস ফোর পর্যন্ত উঠেওছিল। অবশ্যি পরীক্ষায় ফার্স্ট বা সেকেণ্ড কখনো হতে পারেনি। অর্ধেক বই'ই তো ছিল না।

এই যে পুরোন কেল্লা, লাইট হাউস, এ সম্বন্ধে অনেক কিছুই ও বলে দিতে পারে।

সেবার বেশ মজা হয়েছিল। পিকনিকের মরশুম। জনা কয়েক তরুণ ঘুরতে ঘুরতে চলে এসেছিল এদিকে। কেল্লার পেছনে ধান ক্ষেতের ধারে পড়ে থাকা মস্ত লোহার বস্তুটা নিয়ে রীতিমত গবেষণা শুরু হয়ে গিয়েছিল ওদের মধ্যে। জিনিসটা কি অনেক ভেবেও কেউ ঠিক করে উঠতে পারছিল না। মুশকিল গায়ের লেবেলটাও পড়া যাচ্ছে না। হরফগুলো ইংরেজীর মত। কিন্তু ইংরেজী নয়। অনেক ভেবে চিন্তে একজন মত প্রকাশ করল—এটা লোহার থাম জাতীয় কিছু হবে।

পতিত একটু দুরে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করেছিল। হঠাৎ বলে ফেলল, 'ওটা কামান দাদাবাবুরা।'

গোটা দলটাই এক রকম চমকে উঠে ওর দিকে তাকিয়েছিল। কয়েক জোড়া চোখে অবিশ্বাসের ছাপ।

—'কামান! তুই কি করে জানলি?'

একটুও ঘাবড়ায়নি পতিত। তবে পুরো জবাবটিও দেয়নি। দেয়নি ইচ্ছে করেই। বলেছিল, 'বারে এটা যে কেল্লা দাদাবাবু। কেল্লায় কামান থাকবে না!'

একমাথা রুক্ষ চুল। খালি গা, ময়লা ইজের পরা ছেলেটার কথায় কৌতুকের খোরাক পেয়ে এবার হেসে উঠেছিল সবাই। অবশ্যি কয়েক জন একেবারে উড়িয়ে দেয়নি। জিনিসটা কামান হলেও হতে পারে। তবে এত মোটা কামান অবিশ্বাস্য, ইত্যাদি ইত্যাদি—

কেন যে অবিশ্বাস্য সেটা বুঝে উঠতে পারেনি পতিত। অবশ্যি কথা না বাড়িয়ে চলে এসেছিল সেখান থেকে। এ কামানগুলো বসান থাকত কেল্লার মাথার ওপর নদীর দিকে মুখ করে। পুরো নদীটা ছিল কামানের পাল্লার ভেতর। শত্রুপক্ষের কোন জাহাজ যে নদীর ওপার ঘেঁসে পালিয়ে যাবে সে উপায় ছিল না। এপারের কেল্লা থেকে কামান দেগে ডুবিয়ে দেওয়া যেত। প্রায় সমুদ্রের মত চওড়া নদী। তিন চারশো বছর আগে বোধ হয় আরও চওড়া ছিল। সুতরাং বড় কামান না হলে চলবে কেন? তাছাড়া ঐ কামানগুলো তো আর এদেশে তৈরী হয়নি। জাহাজে করে নিয়ে আসা হয়েছিল সাত সমুদ্র তেরো নদীর ওপারের দেশ থেকে।

এসব ছাড়াও আরো অনেক কিছুই পতিত বলতে পারত ওদের। যেমন কামানের গায়ে ঐ যে লেবেলটা—ওটা পর্তুগাল নামে একটা দেশের ভাষা। যে কোম্পানিতে কামানটা ঢালাই হয়েছিল লেবেলটা তাদের। পতিত গুণে দেখেছে মোটমাট ঐ রকম সাতটা কামান ছড়িয়ে আছে কেল্লার আশপাশে। কয়েকটার তো বেশির ভাগটাই তলিয়ে গেছে মাটির নিচে। এ সামান্য একটুখানি যা জেগে রয়েছে মাটির ওপর।

কিন্তু এসব কারুকে বলে না পতিত। বেশ বোঝে ওর যা বয়স, বিদ্যের দৌড় তাতে ওর মুখে এসব বিষয় মানায় না। বললে বিশ্বাসও করবে না কেউ। অথচ এই পুরোন পরিত্যক্ত কেল্লাটা নিয়ে অনেক কিছুই চিন্তা করেছে পতিত। ভর দুপুরে বাঁধের পাশে চালার নিচে বাঁশের তক্তপোষে শুয়ে অথবা নিরিবিলি বিকেলে কেল্লার আশপাশে ঘুরতে ঘুরতে। ওর এই চোদ্দ বছরের ক্ষুদে মগজে যতটা সম্ভব ততটা কিন্তু কিছুতেই থৈ পায়নি। এই কেল্লাটা যারা তৈরী করেছিল তারা ভিনদেশী। কোথায় কোন সাত সমুদ্র তের নদীর ওপার থেকে এসে এই এত বড় কেল্লাটা কি করে যে তারা তৈরী করল, পতিতের কাছে সেটাই একটা বিরাট বিস্ময়!

জলের তোড়ে কেল্লার অনেকটাই আজ ভেঙ্গে পড়েছে। তবুও যেটুকু এখনো অবশিষ্ট রয়েছে তাতে মূল আকৃতির অনেকটাই অনুমান করা যায়। বিরাট কেল্লাটার বেশির ভাগটাই ছিল মাটির নিচে। নদীর পাড় বরাবর বেশ কতকগুলো খিলান আকৃতির চওড়া দেয়াল। ফাঁকে ফাঁকে দরজা কাটা। ওপরে ছাদ। ছাদের ওপর মাটি ফেলে ঢালু করা। এক নদী ছাড়া বাইরে থেকে কিছু বোঝার উপায় নেই। ভেতরে বসে সৈন্যরা দিন রাত্তির নদী পাহারা দিত। বাইরের

সঙ্গে যোগাযোগ ছিল সুড়ঙ্গ পথে। বেশিরভাগ সুড়ঙ্গের-মুখ বন্ধ হয়ে গেলেও গোটা কয়েক এখনো বর্তমান।

এতবড় একটা কেল্লা তৈরী করতে কতদিন লেগেছিল তাদের ? এত লোক লস্করই বা তারা পেয়েছিল কোথায় ? ইঁট, মাল মশলা ! সবই কি তারা জাহাজে করে নিজেদের দেশ থেকে বয়ে এনেছিল ! এদেশের কেউ তাদের বাধা দিল না !! দিব্যি উড়ে এসে জুড়ে বসল। সকলের নাকের ডগায় কেল্লা তৈরী করে গোটা নদীর মোহনাটা নিজেদের কব্জায় রেখে দিল বছরের পর বছর। ওদের বাধা দেবার মত মানুষ কি সে সময় এক জনও এদেশে ছিল না।

ভাবনাগুলো পতিতের মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে আজ বছরখানেক ধরে। ব্যাপারটা ওর ক্ষুদে মগজে ঢোকাবার মূলে রয়েছেন এক অপরিচিত ব্যক্তি। তার আগে ও কেল্লা কথাটার অর্থই জানত না। ওর ধারণা ছিল কেল্লা মানে কোন জমিদারের বাড়ি।

ধুতি পাঞ্জাবীপরা সেই মানুষটি বোধ হয় কোন স্কুলমাস্টার হবেন। বছর চল্লিশের মত বয়স। চোখে সরু ফ্রেমের চশমা। সঙ্গে জনা কুড়ির মত ছেলেমেয়ে। ছাত্রদের নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছেন। পিকনিকের মরশুম নয়। চার পাশটা বেশ ফাঁকাই। কেল্লার আশেপাশে ঘুরে ঘুরে ছেলেদের সব বোঝাচ্ছিলেন তিনি। হঠাৎ এক এক জায়গায় দাঁড়িয়ে গিয়ে নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। চশমার ওপাশে চোখ দুটো থেকে থেকে জ্বলে উঠছিল তখন। ছেলেদের কানে অবশ্যি তার বিশেষ কিছু ঢুকছিল না। অধিকাংশই তখন ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে চারপাশে ছড়িয়ে পড়েছে। সবাই নিজেদের মধ্যে স্থূল রসিকতায় ব্যস্ত। দু'চারজন যারা মাস্টার মশায়ের কাছে রয়েছে তারা কোনক্রমে হুঁ হাঁ করে সময় কাটাচ্ছে। বোঝা যায় নেহাৎ চক্ষু লজ্জার খাতিরেই তারা মাস্টার-মশায়ের সঙ্গ ছাড়তে পারছে না।

প্রায় ঘণ্টা দেড়েক ছিল ওরা। পুরো সময়টা পতিত আঠার মত লেগে ছিল মানুষটার পাশে পাশে। বলা বাহুল্য কিছুটা দূরত্ব বজায় রেখে। প্রতিটি কথা প্রায় গিলে খেয়েছিল। আরে বাসরে ! এতটুকু জায়গায় যে এত রহস্য এত রোমাঞ্চ লুকিয়ে আছে স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি সে। সব দেখা শেষ হলে মাস্টারমশায় যখন ছেলেদের নিয়ে রওনা দিলেন সেও ধাওয়া করেছিল ওদের পেছনে। একেবারে বাসস্ট্যাণ্ড পর্যন্ত।

বলাবাহুল্য নদী, ভগ্ন কেল্লার ধ্বংসাবশেষ, ইতস্ততঃ ছড়িয়ে থাকা পরিত্যক্ত কামান সব কিছু সেদিন থেকে এক নতুন রূপে ধরা দিয়েছে পতিতের কাছে। আগে দিনগুলো যেন কাটতেই চাইত না। এখন কোথা দিয়ে যে সময় পেরিয়ে যায় বুঝতেই পারে না। সারাদিন টো টো করে ঘুরে বেড়ায় কেল্লার চারপাশে। ঝোপে ঢাকা সুড়ঙ্গমুখ দিয়ে নিচে নেমে যায়। মাস্টারমশায়ের বর্ণনা আর নিজের কল্পনার সঙ্গে মিলিয়ে নেয় ভেতরটা। আফশোস হয়—ইস্ যদি আর একবার সেই মানুষটাকে কাছে পাওয়া যেত তো কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর জেনে নিতে পারত।

সেই মাস্টারমশায় আর আসেননি। তার দেখাও আর পায়নি পতিত। কিন্তু এই সময় হঠাৎই এক রাত্তিরে ম্যানুয়েল পেড্রোর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল ওর। শুধু প্রশ্নের উত্তরগুলোই নয় জীবনের ধারাটিই পাল্টে গেল পতিতের। ব্যাপারটা অদ্ভুত।

তারিখটা মনে নেই। পূর্ণিমার রাত। ভরা জোয়ার চলছে। বাঁধের দরজাটা খুলে দিয়েছে পতিত। ভেতরে জল ঢুকছে হু-হু করে। অমাবস্যা বা পূর্ণিমার ভরা জোয়ারেই যা কিছু বেশি মাছ পাওয়া যায়। কপাল ভাল থাকলে জলের টানে ভারী মাছও দু-একটা ঢুকে পড়ে। সুতরাং এ সময় হুঁশিয়ার থাকতে হয় খুব। জল নামা শুরু করলেই খানিক বাদে কাঠের দরজাটা টেনে বন্ধ করে দিতে হয়। কুঁড়ের ভেতর শুয়ে আজ তাই পতিতের চোখে ঘুম নেই। আকাশের তারা দেখে

বোঝা যাচ্ছে ভাঁটা শুরু হতে এখনো ঘণ্টা খানেক বাকি আছে। বাঁশের তক্তপোশের ওপর খানিক এপাশ ওপাশ করে এক সময় উঠে বসে ও। নাঃ ঘুম আসছে না!

ঝাঁপ ঠেলে পতিত এক সময় পায়ে পায়ে বেরিয়ে আসে বাইরে। জোৎস্নায় ম-ম করছে চারদিক, ঝিকমিক করছে নদীর জল। চোখ জুড়ান দৃশ্য! কিন্তু মাঝ নদীতে চোখ পড়াতেই একটু থমকে গেল পতিত। নদীর মাঝে ওটা কি দাঁড়িয়ে—জাহাজ মনে হচ্ছে। চোখদুটো একবার কচলে নেয় ও। নাঃ চোখের ভুল তো নয়। ফুটফুটে জ্যোৎস্নার আলোয় পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে জাহাজটা। খানিক আগেও ও একবার বাইরে বেরিয়েছিল। জাহাজটা তখন দেখেনি। এর মধ্যে জাহাজটা কোন এক সময় নোঙ্গর করেছে। কদাচিৎ দু'একটা জাহাজ বন্দরে ঢুকবার মুখে এখানে নোঙ্গর করে বটে, কিন্তু এমন জাহাজ কোন দিন দেখেনি পতিত। জাহাজের মাঝে একটা চিমনি থাকে। ধোঁয়া বার হয়। এ জাহাজটার কোন চিমনি নেই। তার বদলে মোটা একটা মাস্তুলের মত খুঁটি সোজা উঠে গেছে ওপর দিকে। গুচ্ছের দড়িদড়া ঝুলছে সেটা থেকে। পতিতের মনে হল জাহাজটা বোধহয় পালে টানা। নোঙ্গর করা রয়েছে বলে পালগুলো নামিয়ে ফেলা হয়েছে।

জাহাজটার পানে কতক্ষণ তাকিয়েছিল খেয়াল নেই ওর। বোধ হয় মিনিট কয়েক হবে। হঠাৎ একটা বিরাট একটানা কড়কড় শব্দ কানে আসতে পেছন দিকে চোখ ফেরাতে ভীষণ ভাবে চমকে উঠল।

এ কোথায় দাঁড়িয়ে আছে সে। চারপাশের মাঠ, ধান ক্ষেত, নতুন বাঁধ, পাওয়ার লাইনের উঁচু টাওয়ার বা পুরোন লাইট হাউস কিছুর চিহ্ন-মাত্র নেই। চারপাশে শুধু গাছ আর ঝোপঝাড়। শুধু জঙ্গল আর জঙ্গল। খালটারও কোন অস্তিত্ব নেই। কেবল কেল্লার দিকেই ঝোপ জঙ্গল কিছু নেই। বিরাট জায়গা জুড়ে মস্ত একটা মাঠ। এক পাশে সার সার কতকগুলো খড়ের চালার মত দেখা যাচ্ছে। চাঁদের আলোয় দূর থেকে হলেও বেশ বোঝা যাচ্ছে, অনেক মানুষ ঐ ফাঁকা জায়গাটায় ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছে। কড়কড় শব্দটাও আসছে ওখান থেকেই।

গোড়ায় একটু চমকে উঠলেও সামলে নিতে দেরি হয় না পতিতের। ভয় শব্দটা ওর অভিধানে লেখা নেই। থাকলে এই বিজন প্রান্তরে একা রাতের পর রাত কাটাতে পারত না। ব্যাপারটা সরেজমিনে দেখার জন্য ও পায়ে পায়ে এগিয়ে যায়।

নাঃ দুর থেকেও কিছুমাত্র ভুল দেখেনি। নদীর পারে কোথাও কেল্লার চিহ্নমাত্র নেই। তবে ঢালু নদীর পারে খোঁড়া খুড়ির চিহ্ন। গাথুনির কাজ চলছে। মাথায় করে ইঁট, চুন সুরকির মশলা বয়ে আনছে কুলিরা। মাটি কাটছে। কয়েকশো মানুষ কাজ করে চলেছে। বেশির ভাগই কংকালসার। মনে হয় অনেক দিন পেটপুরে খেতে পায়নি কেউ। পতিত লক্ষ্য করে দেখল মানুষগুলোর দু'পায়ের গোড়ালিতে লোহার বেড়ি পরান। বেড়ির সঙ্গে শেকল আটকান। ইচ্ছে থাকলেও কেউ জোরে হাঁটতে পারছে না। কেউ তো রীতিমত খোঁড়াচ্ছে। তবুও এক মুহূর্তের জন্য থামছে না। নিঃশব্দে প্রায় যন্ত্রের মত কাজ করে চলেছে।

খোলা জায়গার একধারে মস্ত দুটো ইঁটের খোলা। দু'জোড়া করে তেজী বলদ জোয়াল কাঁধে অবিরাম ঘুরছে। ইঁট তৈরীর মাটি পেষাই হচ্ছে। মজুররা পেষাই মাটির তাল মাথায় করে এনে ফেলছে এক যায়গায়। পায়ে শেকল পরা কারিগরেরা ছাঁচে ফেলে ইট তৈরী করছে। সব কিছুই চলছে নিঃশব্দে। ব্যতিক্রম শুধু ঐ কড় কড় আওয়াজটা। শব্দটা সুরকি পেষাই এর। জোয়াল কাঁধে আটজোড়া তেজী বলদ ঘুরছে একসাথে। পাথরের ঘুরন্ত মস্ত চাকির ভেতর কড়কড় শব্দে ইঁটের টুকরো পেষাই হয়ে বেরিয়ে আসছে।

হাড্ডিসার মানুষগুলো এই রাতদুপুরেও কেন যে এমন যন্ত্রের মত কাজ করে চলেছে বুঝতে বিলম্ব হল না পতিতের। ভীড়ের ভেতর গোড়ায় দেখতে পায়নি—অদ্ভুত পোষাকপরা কয়েকটা ভিনদেশী মানুষ ঘুরে বেড়াচ্ছে ওদের ভেতর। দৈত্যাকৃতি চেহারা। ছ'ফুটের নিচে কেউ নয়। মাথায় পাখনা লাগান বিশেষ ধরনের কাপড়ের টুপি। মুখভর্তি দাড়িগোঁফ। পরনে পায়ের সঙ্গে সাঁটা পাজামা। গায়ে জামার উপর বুক খোলা আলখাল্লার মত কোট। কোমরে ঝুলছে খাপে ঢাকা তরোয়াল। হাতে একটা করে চাবুক নিয়ে ভিনদেশী লোকগুলো দাপিয়ে বেড়াচ্ছে চারপাশে। কাজে একটু গাফিলতি দেখলেই, কখনো বা বিনা কারণেই সাঁই সাঁই শব্দে চাবুক চালাচ্ছে শীর্ণ মানুষগুলোর ওপর। চাবুকের যন্ত্রণায় শরীর কুঁকড়ে উঠলেও হাতের কাজ থামছে না কারুর।

পতিত কতক্ষণ যে তন্ময় হয়ে এ দৃশ্য দেখছিল খেয়াল নেই। হঠাৎ ওর বাঁ কাঁধে ছোট্ট করে কে যেন একটু ঠেলা দিল।

—'বয়, টোমার প্রশ্নগুলির উত্তর পাইয়াছ ?'

পতিত ঘাড় ফিরিয়ে দেখল ওর পাশে হাসি-মুখে দাঁড়িয়ে এক ভিনদেশী সাহেব। সেই একই

পোষাক। মুখভর্তি দাড়িগোঁফ। তবে অন্যদের মত অবিন্যস্ত নয়। চেহারায় পোষাকে বেশ একটা আভিজাত্যের ছাপ আছে। কোমরে তরোয়াল বা হাতে চাবুক কিছু নেই। বদলে কোমরে গোঁজা একটা বড়সড় রিভলভার জাতীয় অস্ত্র।

বলা বাহুল্য পতিত একটুও ভয় পায়নি। বরং যে ব্যাপারটা ও চোখের সামনে এতক্ষণ দেখছিল তাতে হঠাৎ এই সাহেবের উপস্থিতি কিছুমাত্র অস্বাভাবিক মনে হল না ওর কাছে। সাহেবের প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বলল, 'তুমি কে সাহেব? এখানে এলে কোত্থেকে?'

সামান্য হেসে সাহেব বলল, 'বয়, আমার নাম ম্যানুয়েল পেড্রো। বহুৎ দূর লিসবন হইতে আসিয়াছি। নদীর মোহনায় এই কিল্লা তৈয়ারী হইতেছে আমারই অধীনে। দুই বৎসর কালের ভিতর কিল্লার কাজ সম্পূর্ণ করিতে হইবে। তাই দিবারাত্র কাজ হইতেছে।'

পতিত জিজ্ঞাসা করল, 'এখানে কতজন কাজ করছে সাহেব?'

পেড্রো বলল, 'সর্বমোট দুই সহস্র দাস কার্যে নিযুক্ত করিয়াছি। টু থাউজ্যাণ্ড। তবে এই মুহূর্তে মোট ছয়শত দাস কার্যে নিযুক্ত রহিয়াছে। অন্যরা কটেজে বিশ্রাম লইতেছে। প্রভাত হইলেই উহাদের কার্যে নিযুক্ত করা হইবে। তোমাদের দেশ হইতেই উহাদের সংগ্রহ করা হইয়াছে। মাত্র ছয় মাসের মধ্যে কার্য অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে। কিল্লার বনিয়াদের কাজ সম্পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। জোয়ারের জলে ডুবিয়া গিয়াছে বলিয়া তুমি দেখিতে পাইতেছ না।'

যে প্রশ্নটা পতিতের মনে অনেক দিন থেকে পাক খেয়ে বেড়াচ্ছে এবার সেটাই জিজ্ঞাসা করল ও, 'তোমরা এখানে কতজন আছ সাহেব?'

—'আমরা সর্বমোট দেড়শত ব্যক্তি আসিয়াছি। তবে এই মুহূর্তে উহাদের পরিচালিত করিতেছে বিশ ব্যক্তি। বাকি সকলে জাহাজে রহিয়াছে।'

—বলে একটু থামল পেড্রো। তারপর পতিতের কাঁধে ছোট্ট একটু নাড়া দিয়ে বলল, 'বয় এইবার নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিয়াছ—সাত সমুদ্র তের নদীর পার হইতে আসিয়া কি প্রকারে বঙ্গদেশে প্রবেশ করিবার নদী-মোহনা নিজেদের দখলে লইয়াছিলাম। তোমাদের দেশ হইতেই শ্রমিক সংগ্রহ করিয়া মাত্র দুই বৎসর কালের মধ্যে কি করিয়া এই বিশাল কিল্লা তৈয়ারী করিয়াছিলাম।'

পেড্রো থামল। পতিত মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, খুব বুঝতে পেরেছি সাহেব। এদেশে সে সময় মানুষ ছিল না। তাই পেরেছ। ঐ যে ছয়শো মানুষ ঘাড় গুঁজে কাজ করে চলেছে ওরাও কেউ মানুষ নয়। হলে তোমাদের মাত্র কুড়ি জনের সাধ্য ছিল না ওদের দিয়ে এভাবে পশুর মত কাজ করাবার।'

—'গুড, ভেরি গুড।'—ভীষণ খুসি হয়ে ম্যানুয়েল পেড্রো পতিতের কাঁধ চাপড়ে দিল—'তুমি বিলকুল যথার্থ কথা বলিয়াছ বয়। তোমাদের দেশে তখন প্রকৃত মানুষ সংখ্যায় অধিক ছিল না। সেই কারণেই এই অসাধ্য সাধন করিতে পারিয়াছিলাম। কিন্তু বয়, আমি বর্তমানেও তোমাদের দেশে তেমন মানুষ বিশেষ দেখিতে পাইতেছি না। অবশ্যই তুমি কিছু ব্যতিক্রম। আমি অনেকদিন হইতেই তোমাকে লক্ষ্য করিতেছি বয়। তোমার ভিতর আগুন রহিয়াছে। বয়, আমি বলিতেছি তুমি লেখাপড়া শিখ। পুনরায় স্কুলে যাইতে আরম্ভ কর।'

পেড্রোর কথায় এবার হেসে ফেলল পতিত। বলল, 'তুমি হাসালে সাহেব। সামান্য দশটা টাকা রোজের জন্য আমার বাবাকে বারো মাইল দূরে নগাছিতে মাটি কাটতে যেতে হয়েছে তা জানো? সংসার চলে না। তাই তো সামান্য কটা পয়সার জন্য আমাকে এই বিজন প্রান্তরে রাতদিন থাকতে হয়। ইচ্ছে করলেই কি আর লেখাপড়া শেখা যায় সাহেব!'

—'আমি টোমার সহিত জোক করিতেছি না

বয়। সব বুঝিয়াই বলিতেছি।'—পেড্রোর গলা এবার বেশ ভারি। পতিত দেখল সাহেবের দু'চোখের কোলে দু'ফোঁটা জল চাঁদের আলোয় চিকচিক করছে।

—'বয়, সুদূর লিসবন হইতে আমি এই দেশে আসিয়াছিলাম। তাহার পর কতদিন অতিক্রান্ত হইয়া গিয়াছে। এ দেশের মায়া আজিও কাটাইতে পারি নাই। আজিও কিল্লার চারিপার্শ্বে একাকী ঘুরিয়া বেড়াই। বয়, তোমাদের এই দেশটাকে বোধ হয়, আমি ভালবাসিয়া ফেলিয়াছি।'

একটু থেমে পেড্রো আবার বলতে শুরু করে, 'বয়, কিছু বাদশাহী মোহরের সন্ধান আমার জ্ঞাত রহিয়াছে। এই কিল্লার অভ্যন্তরে। ইহা ছাড়া কিছু রৌপ্যমুদ্রাও। রৌপ্যমুদ্রাগুলির সন্ধান তোমাকে জানাইয়া দিতেছি। উহা লইয়া তুমি লেখাপড়া আরম্ভ করিবে। স্বর্ণের বাদশাহী মোহরগুলি তোমার এখনও প্রয়োজনে লাগিবে না। যখন লাগিবে আমি পুনরায় তোমার সহিত সাক্ষাত করিব। এখন মনোযোগ সহকারে শুন—'

পতিতের ঘুম যখন ভাঙল তখন শেষ রাত্তির। ভোর হতে বাকি নেই বিশেষ। চোখ কচলে ধড়মড় করে উঠে বসল ও। বাইরে এসে যা দেখল তাতে তখন আর কিছুই করার নেই। বাঁধের খোলা দরজা দিয়ে ভাঁটার জল হু-হু করে নেমে যাচ্ছে। ভেতরে সামান্য জলই তখন অবশিষ্ট রয়েছে। মাছ প্রায় সবই বেরিয়ে গেছে। হায় হায় !! মাথার চুল টেনে ছিঁড়তে ইচ্ছে হল পতিতের। ঘুমিয়ে পড়ে কি সর্বনাশটাই না হয়ে গেল আজ। আবার ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কি একটা আজব স্বপ্নই না দেখল।—পালের জাহাজ—বোম্বেটে ম্যানুয়েল পেড্রো—মোহর, ধুৎ—

ঘুম ঘুম চোখে ব্যাপারটা উড়িয়ে দিতে গিয়েও থমকে গেল ও। মজার স্বপ্নই বটে। স্বপ্নে গুপ্তধনের হদিস। ম্যানুয়েল পেড্রোর শেষ দিকের কথাগুলো কিন্তু এখনো পরিষ্কার মনে রয়েছে। দেখবে নাকি একবার চেষ্টা করে ? মাছের ব্যাপারে এখন তো আর কিছুই করবার

নেই। বরং দেখাই যাক না।

মুহূর্তে মনস্থির করে নিয়ে পতিত ছুটল একেবারে দক্ষিণ দিকে নদীর ধারে কেল্লার যে অংশটা তখনো অটুট রয়েছে সেই দিকে। পেড্রো যে সুড়ঙ্গটার কথা বলেছিল সেটা খুঁজে নিতে অসুবিধা হল না। ভেতরে ঢুকে পড়ল ও। সোজা নেমে ডান দিকে বাঁক! এক, দুই, তিন নম্বর থামের পিছনের দেয়াল। ভেতরে যতটা অন্ধকার হওয়া উচিত ছিল ততটা অন্ধকার নয়। শেষ রাত্তিরের জ্যোৎস্নার আলো নদীর জলে প্রতিফলিত হয়ে ভেতরে কিছুটা পড়েছে। তবুও প্রায় হাতড়ে হাতড়েই জায়গাটা বার করতে হল। দেয়ালের গোড়া থেকে ইঁট ধরে গুনতে শুরু করল— এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত। অন্ধকারে দেয়ালের নির্দিষ্ট জায়গার ওপর বাঁ হাতটা রেখে ডান হাতে একটা ইঁটের টুকরো তুলে নিয়ে দেয়ালে কবার ঠুকে দেখল। ভেতরটা ফাঁপা।

পুরোন নোনা ধরা ইঁট। চুন সুরকির ক্ষয়ে যাওয়া গাঁথুনি। অন্ধকারেই ঠুকে ঠুকে গোটা কয়েক ইঁট বার করে ফেলল পতিত। ঝন্‌ঝন্ শব্দে কতকগুলো চাকতির মত বস্তু নিচে গড়িয়ে পড়ল। আবছা আলোতেও ঝকমক করে উঠল সেগুলো। দেয়ালের ভেতরে একটা কুলুঙ্গি। খুব বেশি বড় নয়। তবে অন্ধকারেও পতিতের বুঝতে বাকি রইল না কুলুঙ্গিটা কাঁচা টাকায় ঠাসা। সব রুপোর!

পতিত আবার স্কুলে যাওয়া শুরু করেছে। পরপর দু'বছর ক্লাসে প্রথম হয়েছে ও, সংসারের হালও কিছুটা ফিরেছে। ওর বাবা ছিদাম মণ্ডল বাজারের কাছে ছোট্ট একটা দোকান দিয়েছে। দু'বছর পেরিয়ে গেছে—ম্যানুয়েল পেড্রো আর দেখা করেনি ওর সঙ্গে। অবশ্যি সে জন্য পতিতের এতটুকু দুঃখ নেই। বরং ম্যানুয়েল পেড্রো যদি ভবিষ্যতে কোন দিন দেখা করতে আসে, পতিত সোজা বলে দেবে, 'না চাইতেই তুমি আমাকে যা দিয়েছ সাহেব তাই যথেষ্ট। সোনার মোহরে আমার দরকার নেই। আমি নিজেকে সোনা বানাতে চাই। সত্যিকারের মানুষ হতে চাই আমি।'

---

২৫০ পৃষ্ঠার উত্তর

পাগলা দাশুর ছবিতে

(১) জলের ধারে (ছবির বাম পাশে) ব'সে থাকা ব্যাঙটা নেই।
(২) খুঁটির ওপরের মাছরাঙার চোখ আঁকা হয়নি
(৩) মাছ শিকারীর মাথায় চুল কম।
(৪) দূরে তালগাছ কম।
(৫) আকাশে পাখীবেশী
(৬) মেঘের ওপরে সূর্য উঁকি মারছে না।
(৭) আকাশে মেঘ কম।
(৮) গাছে ফুল নেই।

নিউস্ক্রিপ্টের বই মানেই ছোটদের ভাল বই

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী
পৌরাণিক কাহিনী (২য় মুদ্রণ) ১০·০০

পুণ্যলতা চক্রবর্তী
ছেলেবেলার দিনগুলি (৩য় মুদ্রণ) ৮·০০

লীলা মজুমদার
উপেন্দ্রকিশোর (৩য় মুদ্রণ) ৮·০০
মাকু (৪র্থ মুদ্রণ) ৭·০০
আজগুবি ১০·০০

নলিনী দাশ
রাণী রূপমতীর রহস্য ১০·০০
হাতীখিসার হানাবাড়ি ১২·০০

শিশিরকুমার মজুমদার
দালাং মিশনের ঘন্টা ৮·০০

মঞ্জিল সেন
গঙ্গোত্রী রহস্য ৬·০০

রেবন্ত গোস্বামী
বাবলা ফুলের গন্ধে ১০·০০

নিরঞ্জন সিংহ
মহাকাল ১০·০০

অশরীরীর আসর ২৫·০০
সম্পাদনা: লীলা মজুমদার, নলিনী দাশ আর সত্যজিৎ রায়

সত্যজিৎ রায়
প্রোফেসর শঙ্কু (৯ম মুদ্রণ) ২০·০০
একেই বলে শুটিং (৪র্থ মুদ্রণ) ১২·০০

স্যার আর্থার কন্যান ডয়্যাল
ম্যারাকট ডীপ ১০·০০
(অনুবাদ: জ্যোতিরিন্দ্রমোহন জোয়ার্দার)

প্রণব মুখোপাধ্যায়
নীল শ্যাওলার খোঁজে ৫·০০
বুড়ির ঝুড়ি ৫·০০

ভবানীপ্রসাদ মজুমদার
নাম তাঁর সুকুমার ৪·০০
মিঠে কড়া পশুর ছড়া ৫·০০
মিঠে কড়া ভূতের ছড়া ২·০০
মিঠে কড়া খেলার ছড়া ২·০০

কমিক্স:

দানোর সন্ধানে
গল্প: মঞ্জিল সেন, ছবি: সিদ্ধার্থ ৩·০০

টোটোর অ্যাডভেঞ্চার
গল্প: নলিনী দাশ, ছবি: প্রশান্ত ৪·০০

নিউস্ক্রিপ্ট: এ/১৪, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-৭০০ ০০৭

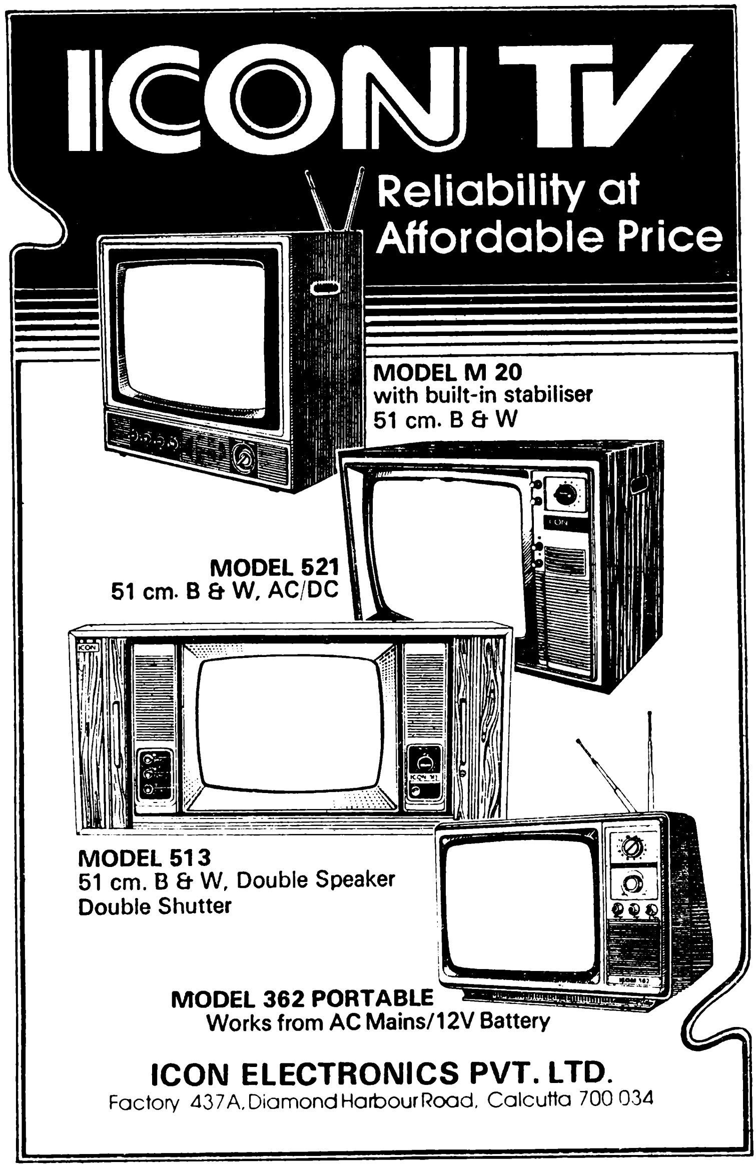

কালিকা প্রিন্টার্স এ্যাণ্ড বাইণ্ডার্স, ১০৯বি, কেশব চন্দ্র সেন ষ্ট্রীট, কলি-৯ দ্বারা
সন্দেশ কার্যালয়—১১২ ৩ রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৯ হইতে
অশোকানন্দ দাশ কর্তৃক প্রকাশিত।